পাটকল থেকে দুনিয়াদারি

নির্বাচিত প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প

গিয়াসউদ্দিন

অন্যতর পাঠ ও চর্চা

পাটকল থেকে দুনিয়াদারি
গিয়াসউদ্দিনের লেখার নির্বাচিত সংকলন
সংকলন সম্পাদনা– বিপ্লব নায়ক

প্রকাশকাল–
বৈশাখ ১৪২৬, মে ২০১৯

প্রকাশক–
অন্যতর পাঠ ও চর্চা
১২৫, রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড, কলকাতা-৭০০০৪৭।
চলভাষ- ৯৮৩৬৩৬৪০৩৫

প্রচ্ছদের চিত্র-
অ্যালবার্টো বুর্‌রি-র স্যাক্‌কো পি এস (১৯৫৩)

মূদ্রণ-
বর্ণনা প্রকাশনী
৪/১০এ, বিজয়গড়, কলকাতা- ৭০০০৩২

বিনিময়-
৩০ টাকা

গিয়াসউদ্দিন (১৯৫৫–২০১৯)-এর
জীবনভোর স্বপ্ন-দেখা, সংগ্রাম ও যাপনের সঙ্গী
সামান্য মানুষদের প্রতি নিবেদিত

রাজার ভাই যতই একা-থাকার গণ্ডি টেনে যাক
যতই বলুক শত্রু আসে বন্ধুর ভেক ধরে
আমি ঠিক গণ্ডি ছেড়ে যাব
শত্রু হোক বন্ধু হোক মানুষের সাথে পাড়ি দেব
জাহান্নামের দিকেও যদি যায়
আকাশপাড়ি থেকে
একে একে ফেলে যাব আমার গয়না যতো
ছড়িয়ে যাব পথে
দেখে ঠিক আমায় খুঁজে পাবে
কাগজকুড়ুনি আমার ছেলে মেয়ে

— গিয়াসউদ্দিন, ২০১৯-এ লেখা কবিতা

সূচি

সামান্য জীবন ● অনুলিখন: বিপ্লব নায়ক ৭
মেহনতী বুদ্ধিজীবী গিয়াসউদ্দিন ● সজল রায়চৌধুরী ১৪

যুক্তি-তক্কো

দামের গুঁতো ২৩
এক শ্রমিকের আত্মহত্যা ২৬
মাদ্রাসা, মুসলমান সমাজ ও জঙ্গিযোগের অভিযোগ ২৯
কী নিয়ে হইচই করা হচ্ছে দেশদ্রোহিতা বলে ? ৩৩
নির্বাচন ও কয়েকটি কথা ৩৮

গপ্পো

ফাটল ৪৩
মস্তান মামা ৪৭
বিপন্ন কোরাস ৪৯
ফকির-কথা ৫৩

রক্তের মধ্যে যে বোধ খেলা করে

কবিতার ইজেলে নিসর্গ... ৫৭
কবিতার আলাপ-সালাপ ৫৮
ছায়ামানুষ ৬১
প্রিয় সৌমেন সমীপেষু ৬২
আগামীকাল ৬৩
প্রতারক তরবারি ৬৪
মুখ ও মুখোশ ৬৫
খুঁজে ফেরা ৬৬
এই পথে ৬৭
নীরবতা ৬৮
জীবন যেমন ৬৯
শেষ ইচ্ছা ৭০
রোজা ৭১

সামান্য জীবন

২০১৮ সালের মাঝবরাবর এক সন্ধ্যায় বজবজে নরেন মণ্ডলের ঘরে বসে নরেন মণ্ডল, জসিমুদ্দিন, শুভাশিস শীল ও বিপ্লব নায়কের উপস্থিতিতে এক আলাপচারিতায় গিয়াসউদ্দিন তাঁর জীবনের কথা এভাবে বলেছিলেন। তাঁর বলা কথার অনুলিখনটি প্রস্তুত করেছে বিপ্লব নায়ক।

১৯৫৫ সালে বজবজের শ্যামপুর শেখপাড়ায় আমার জন্ম।

বাবা চিভিয়ট পাটকলে কাজ করত। মাটির একখানা ঘর। ছাউনির টালি মাঝে মাঝে ভাঙা। বাবার খাটুনির কসুর ছিল না, শরীর খারাপ নিয়ে জ্বর নিয়েও কাজে যেতে দেখেছি। কিন্তু পাটকল কোম্পানি ঠিকঠাক পয়সা দিত না। ম্যানেজারদের কী রোয়াব! শ্রমিকদের ধরে মারধোরও করত তারা। আর ছিল কাবুলিওয়ালা। তার কাছে সব শ্রমিক ধারে জড়িয়ে। কাবুলিওয়ালাকে পাওনা আদায় করতে আমাদের বাড়িতেও আসতে দেখেছি।

সদা অভাবের সংসারে বছরে একবার ঈদের সময় বাবা জামাকাপড় কিনে দিত। সারা বছর ধরে তা-ই চলত।

বহুদিন না খেয়ে স্কুলে গেছি। লেখাপড়াও ঠিকঠাক হচ্ছিল না। যখন আট ক্লাসে পড়ি তখন দেখা গেল যে স্কুলের খরচ আর জোগাড় হচ্ছে না। তখন আমি আমার চেয়ে ছোটদের অ-আ-ক-খ পড়িয়ে নিজের স্কুল-খরচ জোগাড় করতে শুরু করি।

সেই ছোটবেলায় দারিদ্রের চেয়েও এক বড় আপদকে দেখেছিলাম মনে পড়ে। সে আপদ হল ধর্ম নিয়ে দাঙ্গা। ১৯৬৪ সালে বাটানগরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়েছিল। দুই সপ্তাহ ধরে চলেছিল দাঙ্গা। আমরা আমাদের পাড়া থেকেই দেখতে পেয়েছি বাটানগরের দিকের আকাশে ঘর-পোড়ানো আগুনের কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। বহু মানুষ মরেছিল, কোনও মুসলমান ওদিকে যেতে

পারছিল না। তখন চিভিয়ট পাটকলে এক সাহেব— কানিংহ্যাম সাহেব, আর পাটকলের দারোয়ানরা ছিল বেশিরভাগই পাঞ্জাবি। কানিংহ্যাম সাহেব সেই পাঞ্জাবি সাহেবদের নিয়ে পাহারা চালু করল যাতে দাঙ্গাবাজরা ঢুকতে না পারে। আমাদের সব পাড়ায় পাড়ায় কমিটি হয়েছিল, হিন্দু-মুসলমান সবাই আমরা মিলেমিশেই ছিলাম, দাঙ্গার বিষ মাথায় চড়তে পারে নি।

১৯৭২–৭৩ সালে পাটকলে টানা ৬৩ দিন স্ট্রাইক চলল। তখন দুরবস্থা এমন চরমে পৌঁচেছিল যে ঘরের টালি বিক্রি করতে হয়েছে। প্লাস্টিকের সিট চালে দিয়ে রাত কাটাতে হয়েছে।

১৯৭৩ সালে কোনওমতে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করি। কিন্তু তখন দুরবস্থা আরও ঘনিয়েছে। ১৯৭২–৭৪-এ চালের দাম বাড়তে বাড়তে আকাশছোঁয়া হয়ে গেল। ৫ টাকা কেজি চাল কেনা হবে কী করে? চাল বাদ দিয়ে তখন মক্কা, মাইলো, ভুট্টা খেয়ে দিন কেটেছে। তখনকার একটা ঘটনা খুব মনে আছে। বাউড়িয়ায় সস্তায় চাল পাওয়া যাচ্ছে শুনে গায়ে একটা গেঞ্জি চাপিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে বাউড়িয়াতে চলে গিয়েছিলাম চাল আনতে। ১০ কেজি চাল তো নিলাম, কিন্তু ফেরার পথে শুনি যে গঙ্গার খেয়াঘাটে আমলোকেরা চাল কেড়ে নিচ্ছে। জেলা-কন্ট্রোল-এর নিয়ম চালু হয়েছিল তখন, এ তার ফল। কী করব? রোখ চেপে গেল যে এত কষ্টে জোগাড় করা চাল হাতছাড়া হতে দেব না। খেয়াঘাটের দিকে না গিয়ে ট্রেনলাইন ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। চালের বোঝা মাথায় নিয়ে বহু ঘুরপথে হেঁটে, মাঝে কিছুটা ট্রেনে চেপে, নলপুর হয়ে যখন ঘরে ফিরলাম, ঘরের লোকজন তো চিন্তায় পাগল হয়ে গেছে।

এর পরপরই বেশ কিছু ঘটনা ঘটে গেল, তার কথা এখন বলি। স্কুলের একজন মাস্টারমশাই আমাদের পড়ার বাইরেও নানা কথা বলতেন— সরকারের অন্যায়-অত্যাচারের কথা, শোষণ-বঞ্চনার কথা, কিছু কিছু মার্কসীয় তত্ত্ব। আমায় তা আকর্ষণ করত। ধীরে ধীরে বিপ্লব-কামী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ি। সি পি এম, কংগ্রেস-এর লোকদের নোংরা কদাকার কাজকারবার দেখে তাদের থেকে বিকর্ষণ হত। আর অন্যদিকে এম-এল রাজনীতির নানা স্লোগান আর স্বপ্ন: চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস, 'বাঁচতে শেখা' সিরিজ, চে গুয়েভারার গল্প... স্বপ্নের মতো যেন বিপ্লব হয়ে যাচ্ছে। আজ ফিরে তাকালে কেমন অস্বস্তি লাগে, মনে হয় যেন বা আবেগ-উত্তেজনার তুঙ্গে তুলে

দেওয়া সেই কথাগুলোর মধ্যে সারবস্তু ছিল নিতান্তই কম। এমনই আবেগ-উত্তেজনার মধ্যে আমাদের কয়েকজনকে বলা হয়েছিল যে 'বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা'-র গোড়ায় আঘাত হানার জন্য স্কুলে বোমা মারতে হবে। আমরা তা করলামও— কয়েকজন মিলে স্কুলের পাঁচিল টপকে বোমা ছুঁড়ে দিলাম। সে নিয়ে খুব হইচই। আমরা কয়েকজন চিহ্নিত হয়ে গেলাম। আমাদের মধ্যে দুজন এলাকা ছেড়ে গা ঢাকা দিল। একজনকে সি পি এম-এর লোকেরা বাটানগরে খুন করে দিল। ভয় পেয়ে আমার পরিবার থেকে আমাকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত হল।

গা ঢাকা দেওয়ার জন্য আমি চলে গেলাম মগরাহাটের 'উত্তরকুসুম' নামের একটা গ্রামে এক বিশাল মাদ্রাসায়। আমার কাকা ছিল ওই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকের বন্ধু। সেই প্রধান শিক্ষকের হেফাজতে আমি প্রায় বছর দেড়েক ছিলাম। তিনি আমায় আরবি ভাষা ভালোভাবে শেখালেন। আর পড়লুম বেশ কিছু আরবি কবিতা। কবিতার নেশা আমার রক্তে ঢুকে গেল।

বছর দেড়েক পর বাবা যখন আঁচ করতে পারল যে আমি ফিরে এলে আর বিপদ নেই, তখন আবার নিজের বাড়িতে ফিরে এলাম। ১৯৭৬ সালে বাবার কর্মস্থল চিভিয়ট পাটকলেই 'অ্যাপ্রেন্টিস' হিসাবে লেগে গেলাম রোজগারের জন্য। মাসে তখন ১৫০ টাকা দিত। প্রথমে আমি কাজ শিখলাম টিনটার মেশিনে। কিন্তু কাজ শেখার পরও সেখানে জায়গা ফাঁকা না থাকায় অন্য জায়গায় কাজে 'জয়েন' করতে হল আবার নতুন করে সেখানকার কাজ শিখে। সপ্তাহে ২ বা ৩ দিন তখন কাজ হয়। ই এস আই, পি এফ কিছুই তখনও আমার হয় নি। হাজিরে-বাবুকে ২০০ টাকা ঘুষ দিয়ে অনেকে তখন পি এফ করিয়ে নিত। আমি ঘুষ দিতে পারি নি। ১ বছর ওভাবেই কাজ করেছি। রোজগারের অভাব মেটাতে পাটকলের কাজের পাশাপাশি আংশিক সময়ের কর্মী হিসাবে একটা ওষুধের দোকানে কাজ করতাম। ১ বছর পর ই এস আই কার্ড হয়ে পাটকলের 'পাকা লিস্ট'-এ নাম উঠল।

অবশেষে ১৯৮৩ সালে আমার পি এফ হল। তারপর থেকে পাটকলে কাজ পেতে লাগলাম নিয়মিত। কাজের প্রচুর চাপ ছিল। কোনও ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না। সাহেবদের সঙ্গে ঝগড়া করতাম একা একাই। তাই কাজ

থেকে বসিয়েও দিত। খুব রাগ হত এক এক সময়। কাজের চাপে নাজেহাল হয়ে অনেকে 'মিটার চুরি' করত— মিটার খুলে দড়ি দিয়ে টেনে প্রোডাকশনের মাপ বাড়িয়ে নিত। ওসব আমি পারতাম না। আমায় তাই ঝাড় খেতে হত।

একবার আমি ফোরম্যানকে মেরেছিলাম রাস্তায় ধরে। সেই ঘটনাটা বলি। সেদিন কারখানায় কাজে ঢুকে ডিপার্টমেন্টে গিয়ে দেখি মালের যোগান না থাকায় মেশিন বন্ধ। আমি বসে রইলাম। ফোরম্যান পিছন থেকে এসে কাজে ফাঁকি দেওয়ার জন্য গালাগাল দিয়ে ধাক্কা মেরে উল্টে ফেলে দিয়েছিল। রেগে গিয়ে তার সঙ্গে তর্কাতর্কি লেগে গেল। সেদিন আমায় কারখানা থেকে বার করে দিল। পরের দিন কাজে যাই নি, রাস্তার ধারে ওৎ পেতে ছিলাম। ফোরম্যান যখন কাজ থেকে সাইকেলে ফিরছে তখন তাকে সাইকেল থেকে রাস্তায় ফেলে বাঁখারি দিয়ে পিটেছিলাম। পরদিন কাজে যোগ দিতে গেলে আর কোনও ঝামেলা করে নি।

মাইনে কম হওয়ায় মহাজনদের ধারের জালে জড়িয়ে শুকিয়ে মরাই ছিল শ্রমিকদের নিয়তি। হপ্তার দিন (মাইনে হওয়ার দিন) মহাজন ও তাদের এজেন্টরা কারখানার গেটের বাইরে অপেক্ষা করত— শ্রমিকরা বেরলেই হপ্তার টাকা কেড়ে নিত, মারধোরও করত। আর, মহাজনের ধার শোধ হওয়ার নয়। এক এক জনকে তো দেখেছি হাজার টাকা ধার করে লাখ টাকার উপর সুদ গুনেছে, তবু নিস্তার পায় নি।

ই এস আই কার্ড থাকলেও রোগের চিকিৎসা বড় বালাই। ই এস আই-য়ে ডাক্তার ঢোকার কথা ১০টায়, ঢোকে ১১টার পর। রোগিদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করে যে রোগি যেন ইচ্ছা করে রোগ বাঁধিয়ে ডাক্তারবাবুকে হেনস্থা করতে এসেছে। তারপর ডাক্তারবাবু হয়ত তিনটে ওষুধ লিখল, কিন্তু ওষুধ নেওয়ার জায়গায় গিয়ে দেখা গেল যে তার দুটো পাওয়া যাচ্ছে না। তখন আবার ডাক্তারের কাছে এসে পাল্টা ওষুধ লিখিয়ে নেবে এ কার সাধ্য— কার গর্দানে কটা মাথা ? যে ওষুধ পাওয়া যায় তাও ভেজাল। ২৫০ মিলিগ্রাম অ্যামক্সিসিলিন বাইরের দোকান থেকে কিনে ১টা খেলে যা হবে ই এস আই-য়ের দেওয়া ২টো খেলেও তা হবে না। এসব কারণে হতছেদ্দা ধরে যায়। তারপর আবার শরীর খারাপের জন্য ছুটি লেখাতে গেলে ডাক্তারবাবুদের ঘুষ দিতে হয়, ঘুষ না পেলে ছুটি লিখে দিতে চায় না।

চিভিয়ট কারখানার সামনে কুলিলাইন (শ্রমিকদের থাকার জায়গা)-এর মধ্যেই দোতলা পায়খানা— সে যে কী অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা! সোজা ড্রেনের ওপর বসে পায়খানা করতে হবে আর বর্ষা হলেই ড্রেনের জল, পায়খানার জল সব একাকার হয়ে কুলি লাইনের কোয়ার্টারে ঢুকে যেত। আমি ওখানে কখনও পায়খানা করতে ঢুকতাম না, অনেকবার নদীর ধারে গিয়ে পায়খানা সেরে এসেছি।

সি পি এম-কংগ্রেসের ইউনিয়ন নেতারা শ্রমিকদের দূরের মানুষ। তাদের হাবভাব বিপজ্জনক। তাদের কথা মতো না চলে কোনও শ্রমিক অন্যভাবে প্রতিবাদ করতে গেলে এই ইউনিয়ন নেতারাই তাকে ধরে মারধোর করে, ভয় দেখায়, কখনও কাজও খেয়ে নেয়। আমাকেও অনেকবার ওদের হুমকি খেতে হয়েছে।

ডিপার্টমেন্টের সব শ্রমিক যদি একজোট হয়ে যায় তাহলে তারা তাদের দাবি আদায় করে নিতে পারে। কিন্তু শ্রমিকরা নানা ভাগে বিভক্ত। কেউ কেউ ধান্দাবাজির রুস্তম— সাহেবদের কাছে ভালো হওয়ার জন্য অন্যদের সঙ্গে বেইমানি করা, চুকলি কাটায় তারা ওস্তাদ। কেউ কেউ আবার পার্টি-নেতাদের নেকনজরে থেকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজেদের মধ্যে পার্টিতে পার্টিতে ভাগাভাগি ও শত্রুতা লাগিয়ে রাখে। আবার কেউ দুর্নীতির পথকেই মোক্ষ ধরে নিয়ে সবার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে।

এসবের মধ্যেও মাঝে মধ্যে হঠাৎ করে কিছু অন্যরকম ঘটে যায়। তেমনই একটা ঘটনা বলি। আমার রিটায়ার করার আর তখন বছর তিনেক বাকি। একদিন নাইট শিফ্‌ট-এ কাজ করতে করতে শুনি যে একজন শ্রমিকের আঙুল থেঁত হয়ে গেছে পেস্ট-মেশিনের রডে। কিন্তু লেবার অফিসার 'অ্যাক্সিডেন্ট-এর ফর্মে' সই করছে না, শ্রমিককে বলছে ই এস আই ডাক্তারকে ৫০-১০০ টাকা ঘুষ দিয়ে মেডিকেল ছুটি করিয়ে নিতে। আমরা কয়েকজন মিলে লেবার অফিসারের কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম যে সে কেন সই করছে না। সেই অফিসার কোনও জবাব না দিয়ে হম্বিতম্বি করে আমাদের তাড়িয়ে দেয়। নাইট শিফ্‌ট-এর খাওয়ার বিরতিতে আমরা ৫-৬ জন একসঙ্গে বসে ঠিক করলাম যে চালু কলে মাল কাটা বন্ধ করা হবে। বিরতির পর কাজ চালু হলে আমরা মেশিন বন্ধ করে মাল কাটলাম। উৎপাদন কম হতে লাগল। ম্যানেজার যখন খবর পেয়ে কৈফিয়ত চাইতে এল, আমরা বলে দিলাম যে অ্যাকসিডেন্ট ফর্মে সই না হলে

এখন থেকে মেশিন বন্ধ করেই কাটা হবে। এভাবে চলার পর সকালের দিকে ৩-৪ জন ম্যানেজার এসে অ্যাকসিডেন্ট ফর্মে সই করার কথা দেয়।

এভাবে প্রায় ৪০ বছর কেটে গেছে পাটকলে গতর-পুঁজির দুনিয়ায়।

ইতিমধ্যে বিবাহ হয়েছে, বাবা-মা মারা গেছে, সন্তান জন্মেছে। আর গতর-পুঁজির দুনিয়ার বাইরে অন্য এক দুনিয়াতেও যাওয়া-আসা চলেছে। সে দুনিয়া হল বই পড়া ও লেখালেখির দুনিয়া। বজবজ পাবলিক লাইব্রেরিতে অনেক বইয়ের সঙ্গে আলাপ, বই পড়া মানুষদের সঙ্গেও আলাপ। সেই বই পড়া মানুষদের কেউ কেউ পত্রিকা বার করে— কোনওটা সাহিত্য পত্রিকা, কোনওটা আঞ্চলিক খবরের পত্রিকা। নামে বা ছদ্মনামে সেসব পত্রিকায় কয়েকটা কবিতা, কয়েকটা সংবাদ-প্রতিবেদন লিখলাম। এলাকায় ও আশেপাশে কিছু সাহিত্যসভাতেও যাতায়াত শুরু হল। এছাড়া বেশ কিছু মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গেও আলাপ-পরিচয় হল এলাকার এক স্কুলে আরবি ভাষার আংশিক সময়ের শিক্ষক হিসাবে কাজ করতে গিয়ে।

এরপর আমিই একদিন দুটো পত্রিকা সম্পাদনার কাজে জড়িয়ে পড়লাম। প্রথম পত্রিকাটি হল 'শ্রমিকদের হাতিয়ার'। বজবজ পাটকলের দুই বন্ধু নরেন মণ্ডল ও জসিমুদ্দিনের সাথে মিলে শ্রমিকদের নিয়ে শ্রমিকদের লেখা একটা কাগজ বের করার পরিকল্পনা হয়। বাটা কারখানার প্রাক্তন শ্রমিক তারাপদ শী, রাজনৈতিক কর্মী শুভাশিস শীল ও বিপ্লব নায়ক-ও আমাদের সঙ্গে ছিল। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় মুখবন্ধ লেখার দায়িত্ব পড়ে আমার উপর। এ সব গুরু-লিখন আমার লেখনীতে বেরবে কিনা দ্বিধা ছিল। সে দ্বিধা কাটানোর জন্যই আমি চোখ বুজে ভাবার চেষ্টা করেছিলাম 'আমি' যে 'আমরা'-র অংশ, সেই আমরা-র কথা, সে কথাই আমি লিখব। আমি নয়, সেই আমরা-ই বোধহয় আমার লেখনীর মধ্য দিয়ে লিখেছিল:

> আমরা অপরিচিত নই। আমরা আছি কারখানায়, ট্রামে-বাসে সর্বত্র। আমরা শ্রমিক। আধুনিক সভ্যতার ইমারত আমাদেরই হাড়-পাঁজরের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আর, মজার ব্যাপার, যুগে যুগে দেশে দেশে আমরাই সব থেকে উপেক্ষিত, সব থেকে বেশি বঞ্চনার শিকার।
>
> যখনই আমরা মানুষের মতো বাঁচার মতো মজুরি দাবি করেছি, তখনই আমাদের ভাতে মারার জন্য লক-আউট, ছাঁটাই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা কিন্তু আজও বেঁচে আছি, হয়তো ঘরের টালি বেচে, রোদ-জল সাক্ষী।

প্রচণ্ড শ্রমে এই শরীর থম মেরে যেতে চেয়েছে। অত্যাচার-শোষণের কঠিন চাবুক আমাদের ক্ষতবিক্ষত করেছে। অত্যাচারের নতুন কৌশল এই এস-ই-জেড–এর যুগে আমাদের ক্রীতদাসের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে।

তাই হে সমাজের শাসককুল, আমরা আর তোমাদের হাতে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে শুধু লোহা পিটিয়ে শিকল গড়ে যেতে চাই না। লোহা পিটিয়ে হাতিয়ারও হয়। আমরা সেই হাতিয়ার গড়তে চাই যা আমাদের ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি দেবে, সব শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটাবে, সবার মানুষের মতো বাঁচার পথ তৈরি করবে। হে শাসক, তোমরা আমাদের 'ভিখারি পাসোয়ান করে দেব'-গোছের লালচোখ দেখাতে কোনোদিন ভোল নি, ভুলবেও না। তবে কতজনকে ভিখারি পাসোয়ান করবে ? আমাদের স্বপ্নে আমরা সবাই এখন ভিখারি পাসোয়ান— লক্ষ লক্ষ ভিখারি পাসোয়ান।

মেহনতী বন্ধুরা, কথা বলতে সবাই ভালবাসে। কথার মধ্যে আবার অনেক লুকানো কথাও থাকে। আমাদের কিন্তু কোনও লুকানো কথা নেই। আমরা যা বলতে চাই, সোজাসাপটাই বলতে চাই। আপনারাও আমাদের সঙ্গে বলুন। আমরা ছল-চাতুরি-মিথ্যা ও বঞ্চনাকে ঘৃণা করি। সেসবকে উৎখাত করতে যতদূর যেতে হয়, আমরা যেতে চাই। কিন্তু এ চলা আপনারা-আমরা মিলে সমস্ত মেহনতী মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ চলা না হলে পথ তৈরি করে নেওয়া যাবে না। তাই সঙ্গে চলুন।

'আমাদের কথা' শিরোনাম দিয়ে এই মুখবন্ধটি নিয়ে পত্রিকাটি ২০১১ থেকে অনিয়মিতভাবে হলেও ৮ বছরে ১৭-টা সংখ্যা বেরিয়েছে। খান ৩০০ ছেপে আমরাই আমরাই বজবজের বিভিন্ন পাটকলের গেটে দাঁড়িয়ে ২টাকা করে তা বিক্রি করেছি।

আর একটি পত্রিকা হল কবিতার পত্রিকা 'এখন শহরতলী'। সেখানে আমরা কিছু বন্ধুরা কবিতা লিখি, হাতে-হাতে চেনা-পরিচিতজনেদের মধ্যে বিলি হয়। রক্তের মধ্যে যে কবিতারা চরে বেড়ায় তারা অক্ষর হয়ে ফুটে ওঠে তার পাতায়।

শেষ অবধি অন্য একদিনের অন্য এক জীবনের পথেই তো সব চলা গিয়ে মেশে। কিন্তু কৈশোর-যৌবনে যে চলা ছিল আবেগে-উত্তেজনায় ফুটতে ফুটতে বেহেস্তের হুরির ডানায় চড়ে চলা, আজ তা অন্য। আজ অনেক বেদনা ঘিরে থাকে চারদিক থেকে। বহু মৃত্যু ছুঁয়ে যায়। পা ভারি হয়ে আসে। মনে হয় এখনও অনেক বদলাতে হবে নিজেকে— সে শক্তি কি আমার আছে ?

মেহনতী বুদ্ধিজীবী গিয়াসউদ্দিন

সজল রায়চৌধুরী

সদ্যপ্রয়াত গিয়াসউদ্দিনের কিছু প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা নিয়ে এই ক্ষীণকায় সংকলন প্রকাশিত হল। আকারে শীর্ণ হলেও সংকলনটির একটি গভীর তাৎপর্য আছে। দীর্ঘ চল্লিশ বছর চটকলে কাজ করার পর তিনি অবসর নিয়েছিলেন। দারিদ্র্য ও সংগ্রাম এই দুটোই ছিল নিত্যসঙ্গী। কিন্তু যে জন্য তিনি বিশিষ্ট, সেটা তাঁর মননশীলতা।

আমাদের দেশে মানুষকে দুভাগে ভাগ করা হয়— শ্রমজীবী আর বুদ্ধিজীবী। যে শ্রমজীবী সে বুদ্ধিজীবী হতে পারে না, এমনটাই ধরে নেওয়া হয়। আর বুদ্ধিজীবীরা মেহনতের কাজ করবেন সেটা তো যেন ভাবাই যায় না। শ্রমজীবীরা কল চালান আর বুদ্ধিজীবীরা কলম চালান এটাই সমাজের রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে। প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা মেহনতীদের জন্য লেখেন বটে, কিন্তু গতর খাটিয়ে নিজের ভাত-রুটির বন্দোবস্ত করাটা তাঁদের জীবনে দেখা যায় না। গতর-খাটানো মানুষদের মধ্যে বৌদ্ধিক চর্চার ঐতিহ্য— সে তত্ত্বচিন্তায় হোক বা সাহিত্যসৃষ্টিতে— বিরল বলা চলে। কেউ কেউ সে চেষ্টা করলে পিঠ চাপড়ে মুরুব্বিয়ানার ঢঙে তাকে প্রশংসা করা হয়, যেন গ্রেস নম্বর দিয়ে পাশ করানো অনাথ ছাত্র।

অথচ পৃথিবীর মননচর্চার ইতিহাসে অন্য ছবিও দেখা যায়। যারা পরম্পরাগত ভাবে অক্ষরের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত, তাদের মধ্যেও যেমন সবাই নয়, কেউ কেউ বুদ্ধিজীবী। তেমনই মেহনতীদের মধ্যেও বুদ্ধিজীবী হয়ে ওঠেন কেউ কেউ। গ্রেস নম্বর পাওয়া বুদ্ধিজীবী নয়, বৌদ্ধিক চর্চা ও সৃষ্টির ক্ষেত্রে সক্ষমতার ঐশ্বর্যেই তাঁদের অবদান মান্য। মার্কসের সমসাময়িক জোসেফ ডিৎসজেন ছিলেন পেশায় চর্মকার। স্ব-শিক্ষিত এই শ্রমজীবী দার্শনিক সম্পূর্ণ

স্বাধীন ভাবে বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বের সিদ্ধান্তে পৌঁছোন। সমকালীন জার্মান দার্শনিকদের মধ্যে তাঁর অবদান নিজগুণে স্মরণীয়।

উনিশ শতকের ইউরোপে আরও বেশ কিছু শ্রমিক বুদ্ধিজীবীর কথা জানা যায়। তাঁদের কয়েকজনের কথা বলা যাক:

আঁতোয়া আরনাউদ— ফ্রান্সের রেলশ্রমিক। প্যারি কমিউনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। 'মার্সেই' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এই বিপ্লবীর মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি ঘোষণা করা হয়। কোনওক্রমে প্যারি থেকে পালিয়ে এসে লন্ডনে প্রথম আন্তর্জাতিকে যোগ দেন।

জোহান জর্জ একারিয়াস— জার্মান। পেশায় ছিলেন দর্জি। শ্রমিকশ্রেণির রাজনীতির লেখক ও প্রচারক। প্রথম আন্তর্জাতিকের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন একসময়, তার আগে তিনি কমিউনিস্ট লিগের সদস্য। ১৮৭২ সালে মার্কসের সঙ্গে তাঁর প্রবল বিতর্ক হয়। তিনি প্রথম আন্তর্জাতিক ত্যাগ করেন।

ফ্রানসিসকো মোয়া— স্প্যানিশ শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রণী কর্মী। পেশায় চর্মকার। স্প্যানিশ ভাষায় 'মুক্তি' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য।

এছাড়াও স্মরণীয় হয়ে আছেন ব্রিটিশ বয়ন কারিগর জন হ্যালেস, জার্মান ঘড়ি কারিগর হারমান ইয়ুং, ফরাসি বাদ্যযন্ত্র কারিগর অঁজা দুপঁ।

গ্রামশি যে সাঙ্গিক বুদ্ধিজীবীর কথা বলেছিলেন, এ প্রসঙ্গে সে কথাও মনে পড়ে। একসময় মনে হত এসব ইউরোপীয় রূপকথা। বুদ্ধিজীবী আর শ্রমজীবীর দ্বিভাজন দেখতে আমরা অভ্যস্ত সেকথা তো আগেই বলা হয়েছে। এর সঙ্গী হিসেবে আর একটা ধারণা প্রচলিত, সোজাসুজি নয় নানা আবরণে, যে বুদ্ধিজীবীরাই নেতৃত্ব দেবেন শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসেবে। আজকের অনেক অন্ধকারের জন্ম এই ধারণা থেকে।

গিয়াসউদ্দিনের গদ্যপদ্যের নির্বাচিত সংকলন প্রসঙ্গে এসব কথা বলছি কেন ? মেহনতীর শ্রম, ঘাম, দারিদ্র্যে মাখামাখি জীবনে এমন কি কোনও জাদু আছে যা তাঁর কলম থেকে সোনা ফলায় ? না, সেকথা বলা ভুল হবে। বরং, প্রথাগত শিক্ষা থেকে প্রায়শ বঞ্চিত থাকায় অনেক সময় বৌদ্ধিক ঐতিহ্যের ধারা তাঁর ধরাছোঁওয়া থেকে দূরে থেকে যায়। লোকধারা সে কিছুটা ছুঁলেও ছুঁতে পারে, কিন্তু মননে শান দেওয়ার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। অন্যদিকে শিক্ষিত মেধাজীবীর উৎসে এমন কোনও সুনিশ্চিত মন্ত্র নেই যে উচ্চশিক্ষিত অ-মেহনতী

মানুষ মাত্রেই মননের বিভায় সমুজ্জ্বল হবেন। মেহনতী বা অ-মেহনতী দু-তরফের লেখক-শিল্পীদের (মননের এদিকটাই এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক) মধ্যেই দুর্বল ও সবল গোত্রের 'স্রষ্টা' আছেন। এদের দুপক্ষকেই কলাক্ষেত্রের একই মাঠে একই নিয়মে খেলতে হয়। কারও জন্যই কোনও সংরক্ষণ বা বিশেষাধিকার নেই। ঐতিহ্যের ধারায় বিকশিত শিল্পের নিয়ম মেনেই তাদের নতুন নিয়ম গড়তে হয়। মেহনতীর জন্য বিশেষ ছাড়ের কোনও ব্যবস্থা নেই। তাঁদের অবসর ক্লান্তির ক্লেদে মন্থর। স্ব-শিক্ষার উপকরণ জোগাড়ের জন্য ক্ষুধিত মন নিয়ে তাঁকে এখানে ওখানে ঝাঁপাতে হয়। এভাবেই একটা নির্দিষ্ট যুগের কলাক্ষেত্রের কলাকৌশল তাঁকে আয়ত্ত করতেই হয়। এই কঠিন প্রতিযোগিতার হাত থেকে মুক্তি নেই। অথবা এতেই তাঁর মুক্তি।

গিয়াসউদ্দিন কীভাবে এই মুক্তি খুঁজেছিলেন তার পরিচয়ের আভাস এই সংকলনে পাওয়া যায়। গিয়াসউদ্দিন একা, এবং গিয়াসউদ্দিন অনেকের একজন। এই দুয়ের নিরন্তর সংলাপ প্রবন্ধে, কবিতায়, গল্পে ধরা আছে।

প্রথমে তাঁর প্রবন্ধের কথায় আসা যাক। 'এক শ্রমিকের আত্মহত্যা' প্রবন্ধে পাটকলের বদলি শ্রমিক দীপক দাসের আত্মহত্যার খবর গিয়াসউদ্দিনকে নড়িয়ে দিয়েছে। এ খবরের প্রতিক্রিয়ায় মননশীল কোনও বুদ্ধিজীবী রাশি রাশি সংখ্যা-তথ্য দিয়ে শোষণ সম্বন্ধে এক নিরাবেগ নিবন্ধ লিখতেই পারেন। সেটা অপ্রয়োজনীয় তাও বলছি না। কিন্তু গিয়াসউদ্দিনের প্রতিক্রিয়ার ধরণ ভিন্ন। দীপক দাসের মধ্যে তিনি নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেয়েছেন, অস্থির হয়ে উঠেছেন আত্মঘাতী তরুণটির জন্য। ভেবেছেন তরুণটির পরিজনদের ভবিষ্যতের কথা:

> দীপক দাসের আত্মহত্যা তাঁদের জীবনকে যে বাজের-আঘাতে-পোড়া গাছের মতো পুড়িয়ে দিয়ে গেল, সে জীবনে কি আর নতুন পাতা, নতুন কুঁড়ি ফুটবে ? (পৃষ্ঠা-২৬-২৭)

বড়ো মমতা ফুটে উঠেছে লেখকের গলায়। হয়তো হাহাকারও। এই হাহাকার তাঁকে নিয়ে গেছে আত্মসমালোচনায়। নানা মঞ্চে পার্মানেন্ট ও বদলি শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের কথা শোনা গেছে। শ্লোগানের বাইরে অবশ্য বিশেষ কিছু এগোয়নি। গিয়াসউদ্দিন আর এক পা এগিয়ে আয়না ধরেছেন নিজের মুখের সামনে। পার্মানেন্ট শ্রমিক হিসেবে আত্মগ্লানিতে পুড়েছেন:

> আমরা যারা পার্মানেন্ট শ্রমিক ছিলাম, তারা কি বদলি-কনট্রাক্ট শ্রমিকদের সমস্যাকে সমস্ত শ্রমিকদের সমস্যা হিসেবে দেখে তা সমাধানের পথ নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছি ? পিছন ফিরে দেখলে মনে হয় যে, না, করিনি। এইখানেই তেইশ বছরের দীপক দাসের আত্মহত্যা আমাকে অপরাধী চিহ্নিত করে যায়। (পৃষ্ঠা– ২৮)

এখানেই গিয়াসউদ্দিন হয়ে ওঠেন একই সঙ্গে আত্মঘাতী দীপক দাস এবং তার ঘাতক। নিহত হরিণ ও রক্তাক্ত নিষাদকে গিয়াসউদ্দিন একইসঙ্গে ধারণ করেন তাঁর চেতনায়। এখানেই মেহনতী বুদ্ধিজীবী হিসেবে একটি উপাদান দেখতে পাই।

শ্রমিক হিসেবে গিয়াসউদ্দিনের যন্ত্রণার পাশাপাশি আর একটা যন্ত্রণার শিকার তাঁকে হতে হয়। যতই তিনি মুক্তচিন্তার পথিক হোন না কেন, সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজের অংশ হিসেবে এ দেশে জঙ্গি আর দেশদ্রোহী বলে তাঁদের দিকে আঙুল তুলে দেখানো হয়। গিয়াসউদ্দিন 'মাদ্রাসা, মুসলমান সমাজ ও জঙ্গিযোগ' প্রবন্ধে খরশান যুক্তির সাহায্যে সরকার ও কাগুজে বুদ্ধিজীবীদের অভিযোগকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন। এই লেখায় তাঁর শীলিত তির্যক বাকভঙ্গি যে উজ্জ্বলতায় ঝলসে উঠেছে তা যে কোনও প্রথম সারির সাংবাদিকের দক্ষতার সমতুল্য। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা মাদ্রাসা থেকে আরবি বই পেলেই (যেটা না পাওয়াটাই অস্বাভাবিক) পুলকিত হয়ে আরবভূমির সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে মাদ্রাসাটির যোগ আবিষ্কার করে ফেলেন। গিয়াসউদ্দিন মন্তব্য করেন:

> মহামহিমগণ, বিচক্ষণতার জোব্বার তলায় এ কী নির্বুদ্ধিতার প্রকাশ!... যাই হোক, মহামহিমগণ, ঢেঁকি যেমন স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, তেমনই আপনারা তো আপনাদের কাজ চালিয়েই যাবেন। (পৃষ্ঠা- ৩০,৩১)

গিয়াসউদ্দিনের বাংলা গদ্য তীক্ষ্ণ, প্রাঞ্জল, লক্ষ্যভেদী। যুক্তির সঙ্গে সমবেদনা, বলা উচিত খাঁটি দরদ মিশিয়ে, চাপা ক্রোধের তাপ মিশিয়ে এক অসাধারণ শৈলী গড়ে তুলেছেন তিনি। নানারঙের ঝাণ্ডার ভোটপার্টিদের ভণ্ডামি খুলে দিতে তিনি লেখেন:

> তাই শ্রমিকরা ভোটের লড়াইয়ে যে পক্ষই নিক না কেন, গেরুয়া-সবুজ-লাল যে রঙেই সামিল হোক না কেন, তার জীবন একই রকমের বিবর্ণ বেরঙা হয়ে থাকে— কান্নার কি কোনও রঙ হয় ? ক্ষয় ও হাহাকারের কি কোনও রঙ হয় ? অনাহারে শুকিয়ে মরারই বা রঙ কী ? (পৃষ্ঠা- ৩৯)

এই বেদনার স্বরটি প্রবন্ধের শেষে 'ভোটব্যাপারিদের' নানা পতাকার তলায় মাথা মুড়োনো মেহনতীদের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া পরিহাসের দিকে মোড় নেয়। সেখানেও কী দক্ষতা!—

> ন্যাড়ার কি মাথা ফেটে গেলেও বেলতলায় যাওয়া থামবে না ? (পৃষ্ঠা- ৪০)

কবিতা সম্বন্ধে গিয়াসউদ্দিনের নিজস্ব মতামত আছে 'এখন শহরতলী' পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলিতে। এক জায়গায় লিখছেন:

> অত্যাচারিত মানুষের, মানুষদের ঘুরে দাঁড়ানোর ভিটে হয়ে উঠুক কবিতা। (পৃষ্ঠা- ৫৯)

কবিতায় মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোর কথা নানা সময়ের কবিরা বলেছেন। যেমন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

> মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
> যার ভয়ে ভীত তুমি সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
> যখনই জাগিবে তুমি তখনই সে পলাইবে ধেয়ে।
>
> (এবার ফিরাও মোরে)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ে পাই সুনির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞা:

> পালানোর পথে ধুলো ওড়ানোর দঙ্গলে ভাই
> আমিও ছিলাম একজন
> ভীরুতার মুখে লাথি মেরে লাল ঝাণ্ডা ওড়াই।

কবিতা বারবার ঘুরে দাঁড়ানোর ভিটে হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে ভিটেগুলোর ধরন, নকশা কবিতার ঐতিহ্য অনুযায়ী এক এক রকম। গিয়াসউদ্দিন একথা জানতেন বলেই তাঁর ঘুরে দাঁড়ানোর কবিতার শৈলীতে আধুনিক কালের মন্দিরাই বাজে:

> তাই হাঁটতে হাঁটতে দেওয়ালের মুখোমুখি হলেও
> অপ্রতিহত সময়
> ওস্তাদ কারিগরের মতো কাপড় ছেঁটে ছেঁটে
> এক স্বপ্নের পৃথিবী নির্মাণ করে চলেছে—
> অতীতে এই চিত্রকল্পেই তো
> গোলাপ ফুটেছিল।
>
> (ছায়ামানুষ)

এখনও কবি স্বপ্ন দেখেন:

সুখউড়ানির চরে নিঃসঙ্গ শালিখ
ঠোঁটে ঠোঁট রেখে স্বপ্ন চালান করে
আপন আত্মজে।

(আগামীকাল)

সৎ কবি হতাশার কথাও গোপন করেন না। ক্ষোভের ফুৎকার তুলে বলেন:

জীবনযাপন শালা সকালের স্বৈরিণীর মতো।

(প্রিয় সৌমেন সমীপেষু)

কাজী নজরুল ইসলাম তির্যক প্রশ্ন তুলেছিলেন:

যাহাদের ঘরে হররোজ রোজা
ক্ষুধায় আসে না নিদ
তাহাদের ঘরে এসেছে কি আজ ঈদ ?

গিয়াসউদ্দিন আরও গভীরে গিয়ে দীর্ঘশ্বাসের মতো দুটো পংক্তি উচ্চারণ করেন:

বঞ্চনার এ জীবন জুড়ে চলছে রমজান
রোজাতেই চলে গেল আল্লাহর দেওয়া প্রাণ

(রোজা)

যে কেউ বলবেন আধুনিক কবিতার চলন তাঁর করায়ত্ত। মেহনতী হওয়ার দরুণ নয়, গদ্য-পদ্যে মননে তিনি আমাদের সম্ভ্রম আদায় করে নেন নিজ গুণেই। অবশ্য ছোটগল্প লেখায় তাঁর এই শিল্পসিদ্ধি ঘটেনি, একথা বলতেই হবে।

সবশেষে, গিয়াসউদ্দিনের সম্বন্ধে তাঁর সাহসের কথা বলতেই হয়। প্রকৃত বুদ্ধিজীবীর সত্তা দুর্জয় সাহস দিয়ে গড়া। সবরকম অত্যাচার, কুৎসা, অন্ধত্বের বিরুদ্ধে তর্জনী তুলে তাঁরা বলতে পারেন:

তোর চেয়ে আমি সত্য
এ বিশ্বাসে প্রাণ দেব দেখ

(ঝড়ের খেয়া, রবীন্দ্রনাথ)

প্রাণ তাঁরা দিয়েছেনও। সম্প্রতি হিন্দুত্ববাদী ঘাতকদের হাতে খুন হয়ে গেলেন কলবুর্গি, পানসারে, দাভোলকর, গৌরী লঙ্কেশ। গিয়াসউদ্দিনও স্পষ্ট ভাষায়

লিখেছেন রাষ্ট্রীয় ও হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, লিখেছেন কাশ্মীরের স্বশাসনের সপক্ষে, লিখেছেন রাষ্ট্রদ্রোহিতার মিথ্যে অভিযোগে অভিযুক্ত ছাত্রদের সপক্ষে। প্রচারবিমুখ এই মেহনতী বুদ্ধিজীবী ছোট এলাকায় কাজ করছিলেন। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তাঁকে ছোঁওয়ার আগেই কর্কট তাঁকে কেড়ে নিল।

যুক্তি-তক্কো

দামের গুঁতো

খবরের কাগজে আর রাস্তার ব্যানারে দেখছিলাম কোথায় কোথায় যেন ইলিশ উৎসব চলছে। আমার সহকর্মী পাটকলিয়া কালিপদ পাড়ুইকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: কী ভাই, ইলিশ মাছ খেয়েছ ?

কালিপদ ভায়া আঁক করে ওঠে: আঁ— দাম জানো ? পাঁচশো সাইজের মাছ চারশো টাকা কেজি, আমি যা রোজ পাই তার থেকেও ষাট টাকা বেশি— দাদা, আমাদের কপালে ওসব খাওয়া নেই, আমাদের কপালে আছে নিহেড়ে...।

চুপ মেরে গেলাম। কিন্তু মনে মনে ভাবতে লাগলাম ক্যামনে আমাদের কপালটা এরকম হল।

কেন এই মূল্যবৃদ্ধি ? তেলের দাম বেড়েছে, তাই পণ্য-পরিবহন খরচ বেড়েছে। কেন তেলের দাম বাড়ল ? আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম নাকি খানিকটা কমে গেছে, তবে তেলের দাম বাড়িয়ে দিল কেন ? টাকার দাম নাকি পড়ে যাচ্ছে, তাই টাকার যোগান ঠিকঠাক রাখতে, টাকার দাম পড়া আটকাতে নাকি আন্তর্জাতিক বাজারে দাম পড়লেও আমাদের এখানে দাম বাড়াতে হবে ? এভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানিগুলো লাভ করবে, সরকারের আয় বাড়বে...

এই অবধি ভাবতেই হাসি পেল কারণ মনে হল, আহা, ব্যাঙের পেচ্ছাপ দিয়ে সাগরের জল বাড়ানোর এমন রূপকথা কি আর হয় গো! সরকার আমাদের মতো হাড়-হাভাতেদের পকেট হাতড়ে কানাকড়ি জমিয়ে তার আয় বাড়াতে চায়, আর অন্যদিকে কখনও থিরি জি, কখনও কোল বলক কাণ্ডতে লক্ষ-কোটি-পতিদের ছাড় দিয়ে দিচ্ছেন লক্ষ কোটি টাকা (দুর্জনে নানা ঘুষ-ঘাষড়া, স্বজনপোষণের মোচ্ছব দেখছেন এর মধ্যে, সে পরনিন্দা পরচর্চায় না হয় নাই ঢুকলাম)! সরকার আমাদের গরিবদের পকেট থেকে পয়সা টেনে নেওয়ার জন্য সাগর-শোষা টান

মারছেন আর তার পেছন খোলা— সে পেছন দিয়ে সাত সাগর ধন তুলে দিচ্ছেন মালিক-পুঁজিপতি-বড়লোকদের হাতে।

সাগরের কথা চলে আসায় হাঙরের কথা মনে পড়ে গেল। হ্যাঁ, এ কিস্‌সায় হাঙরও আছে। খুচরো ব্যবসার জল-টলটল দীঘি কি দেশি রাঘব-বোয়ালরা চুনোপুঁটিদের জন্য ছেড়ে রাখতে পারেন? তাঁরা (টাটা, বিড়লা, আম্বানিরা) ঝাঁপিয়ে পড়লেন সে দীঘিতে আর চুনোপুঁটি গিলে গিলে ক্রমশ হাঙর হয়ে উঠলেন। ধরা যাক আরামবাগ আর সিঙ্গুরে যত আলু উৎপাদন হল, দুটো হাঘরে বোয়াল-হাঙর তার সবটাই কিনে নিয়ে হিমঘরে ঢুকিয়ে দিল। ফলে কী হল? বাজার থেকে আলু উধাও। মাল আছে— তবে কড়কড়ে ৬ টাকার জায়গায় ১৬ টাকা ছাড়ো, তবেই মাল পাবে। চাষীরা কিন্তু ঠিক পয়সা পায় নি— সে যে ধারদেনা করে আলু চাষ করেছিল, তার খরচও উঠছে না। সেই কারণেই বেশ কয়েকজন চাষী ঋণের অক্টোপাস-বাঁধন থেকে মুক্তি পেতে আত্মহননের পথই বেছে নিয়েছেন। সরকার মাত্রেই ঘোরতর পশুপ্রেমী— এইসব রাঘব-বোয়াল-হাঙরদের রক্ষা করার, তাদের স্বার্থ দেখার জন্য তাঁরা নিজেদের নিবেদন করেছেন।

ফলে, ভায়া কালিপদ, জিনিষপত্রের দাম আর আমাদের নাগালের মধ্যে থাকবে কী করে? কপালের দোষ নয় রে কালি...

এসব ভাবতে ভাবতে পেচ্ছাপ করে, বিড়ি টানা শেষ করে, টিফিন শেষে মেশিনের গোড়ায় ফিরছিলাম, হঠাৎ দেখলাম বেশ কিছুজন নোটিশ-বোর্ডের সামনে জটলা করেছে। কোম্পানি নতুন নোটিশ মেরেছে, তা দেখছে। গিয়ে দেখি আজব ব্যাপার, সরকারবাহাদুরের হিসাব মতো পাটকলিয়াদের ডি এ নামক মাগ্‌গিভাতা কমে গেছে— কোম্পানি তাই নোটিশ দিয়ে জানিয়েছে। সব জিনিষের দাম বেড়ে গেল আর পাটকলিয়াদের বাজার খরচ কমে গেল— সরকারের পোষা হিসাববাবুদের হিসাবের মাহাত্ম বোঝা ভার! তবে ক্রমশ এ পাটকলিয়া মগজেও সে মাহাত্মের উপলব্ধি জিগুর কাটতে লাগল। সমস্ত জিনিষের মূল্যবৃদ্ধি যাঁদের উদ্দেশ্যে ভোগ চড়ানোর নিমিত্তে (অর্থাৎ যাঁদের মুনাফা, উপার্জন বাড়ানোর জন্য) উৎসর্গীকৃত, সেই হাঙর-বোয়াল মালিক-পুঁজিপতিদের ভোগে (অর্থাৎ মুনাফাবৃদ্ধিতে) তো আর একটা উপাদানও না হলে চলে না। সে উপাদান হল আমাদের মতো গতর-খাটিয়েদের গতরের দাম কমানো। আমাদের গতর না খেলে ওদের মেশিন চলবে না, মুনাফাও জমবে না।

আমাদের গতর ওদের কিনতেই হবে আর তার দামও ক্রমশ কমাতে পারলে তবেই ওদের মুনাফা চড়বে। সব জিনিষের মূল্যবৃদ্ধি হবে আর মজুরি বাড়বে না— এইভাবে কাগজেকলমে মজুরি না কমিয়েও তো আসলে মজুরি কমিয়ে দেওয়া হয়। আজ যে ভরপেট খেয়ে মেশিন ঠেলে কাল সে আধপেট খেয়ে মেশিন ঠেলবে— মালিকদের তাতে কী এসে যায়। একটা হাভাতে শ্রমিক মরলে হাজারটা হাভাতে বেকার তার জায়গা নিতে বসে আছে। অতীতে শ্রমিকদের লড়াই-আন্দোলনের ফলে এই সোজাসাপটা ব্যবস্থায় কিছুটা বিঘ্নস্বরূপ যে ডি এ বা মাগ্‌গিভাতার নিয়ম তারা চালু করতে বাধ্য হয়েছিল, তক্কে তক্কে থেকে কীভাবে সে নিয়মকে আবার গোর দেওয়া যায় সে চেষ্টা তো তারা করবেই।

তাই কালিপদ, সমস্যাটা তোর-আমার কপালের নয়। সমস্যাটা তোর-আমার মতো সবার যাদের গতর বেচে খাওয়া ছাড়া আর কোনও পথ নেই। যারা আমাদের গতর কিনে পুঁজি খাটিয়ে মুনাফার ধান্দা করে বাঁচছে তারাই সমাজ-সংসার চালাচ্ছে রে, আর তাদের মুনাফা বাড়াতেই সবকিছুর দাম বাড়ছে, আবার গতরের দাম পড়ছে। ফলে বাপ-ঠাকুর্দারা ইলিশ খেত, আমরা খাই নিহেড়ে, আমাদের ছানাপোনারা কী খেতে পাবে কে জানে!

–শ্রমিকদের হাতিয়ার, সেপ্টেম্বর ২০১২

এক শ্রমিকের আত্মহত্যা

সব মৃত্যুর সঙ্গেই বেদনা জড়িয়ে থাকে। কিন্তু কোনো মৃত্যু যদি আপনাকে নিজেকে অপরাধবোধ ও অসহায়তার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, তাহলে সেই মৃত্যুর বেদনা সবচেয়ে মর্মন্তুদ। এমনই এক মৃত্যুর মুখোমুখি হলাম সদ্য। সে মৃত্যু এসে সামনে দাঁড়াল পারিবারিক জীবনে নয়, খবরের কাগজের মধ্য দিয়ে। ১৪-ই সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখের টাইমস অফ ইন্ডিয়া কাগজের ভিতরের পাতায় মুখ লুকিয়ে ছিল খবরটা। মাত্র তেইশ বছরের যুবক দীপক দাস আত্মহত্যা করেছে। সে ছিল গোন্দলপাড়া জুটমিলের বদলি শ্রমিক। দীর্ঘদিন কাজ না পেয়ে কারখানা গেট থেকে ঘুরে আসতে আসতে সে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তারপরই একদিন সে নিজের জীবনে ইতি টেনে দেয়।

আমি নিজেও একজন জুট-শ্রমিক। বজবজের চিভিয়ট মিলে চল্লিশ বছর কাজ করার পর সদ্য রিটায়ার করেছি। খবরটা আমায় কেমন অস্থির করে তুলল। কিছু একটা যেন এখনই করা দরকার আমার। কিন্তু কী করব? ছেলেটির পরিবারের পাশে ছুটে গিয়ে দাঁড়াব নিজের সমবেদনা নিয়ে? তার পরিবারে কে কে রয়ে গেল, কীভাবে তাদের দিন চলবে, এইসব নিয়ে খবরের কাগজের অতি ছোট প্রতিবেদনে কিছুই লেখেনি। এসব অবশ্য তাদের লেখার কথাও নয়, কারণ শ্রমিকদের সংসার কীভাবে চলবে তা নিয়ে আর খবর-ব্যাপারীরা কবে মাথা ঘামিয়েছে? দীপক দাসের বাবা-মা বেঁচে থাকলে হয়তো আমারই সমবয়সী, সে বিবাহ করে থাকলে তার অকাল-বিধবা বৌ হয়তো আমারই মেয়ের মতো, অথবা তার কোনো অবিবাহিত বোন বা দিদি থাকলে সেও তো আমার মেয়েরই বয়সী। তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আজ কী বলবো? হ্যাঁ, এইটুকু বলতে পারি যে চিন্তা নেই, পেনশন-গ্র্যাচুইটির জোরে আমার যা সামর্থ্য তা নিয়ে আমি তাদের পাশে আছি। কিন্তু তাই-ই কী সব? দীপক দাসের

আত্মহত্যা তাদের জীবনকে যে বাজের-আঘাতে-পোড়া গাছের মতো পুড়িয়ে দিয়ে গেল, সে জীবনে কি আর নতুন পাতা, নতুন কুঁড়ি ফুটবে ?

এই সমস্ত চিন্তা আমাকে ঘিরে ধরতে থাকে, আমাকে অসহায় করে তুলতে থাকে। আর কোনদিনের পরিচয়-না-হওয়া দীপক দাস যেন আমার চারদিকের পরিচিত বহু যুবকের চেহারা ধরে এসে বলতে থাকে, চাচা, আমাদেরও কি আত্মহত্যাই পরিণতি ?

চিভিয়ট মিল চত্বরের অদূরে শ্রমিক মহল্লার কাছেই আমার বাড়ি। আমার বয়স যে যুবকদের কাছে আমাকে চাচা করে তুলেছে, তারা এই চত্বরের কোনও-না-কোনও জুটমিলেরই শ্রমিক— কেউ বদলি শ্রমিক, কেউ কন্ট্রাক্ট শ্রমিক। আমি নিজেও এই বয়সে প্রায় বছর পঁয়তিরিশ আগে জুটমিলের শ্রমিকই ছিলাম। কিন্তু আমার সে সময়ের সঙ্গে আজকের এই বদলি-কন্ট্রাক্ট শ্রমিক যুবকদের অবস্থার বিস্তর ফারাক। আমাদেরও পার্মানেন্ট হওয়ার আগে অবধি প্রায়ই কাজ না পেয়ে বাড়ি ফিরে আসতে হয়েছে, রোজগার মারা গেছে, অভাব ঘাড়ে চেপে বসেছে, কিন্তু আজকের বদলি-কন্ট্রাক্ট শ্রমিক যুবকদের অবস্থা আরো আরো বহুগুন খারাপ। আমাদের সময়ে যেদিন কাজ পেতাম, সেদিনের মজুরি পার্মানেন্ট শ্রমিকদের সমানই হত, আর আজকের বদলি-কন্ট্রাক্ট শ্রমিকরা যেদিন কাজ পায়, তাকে কাজ করতে হয় পার্মানেন্ট শ্রমিকদের অর্ধেক, কখনও বা তিনভাগের একভাগ মজুরিতে। আমাদের সময়ে নিশ্চয়তা ছিল যে কিছুদিন পরে আমরা পার্মানেন্ট হয়ে যাব, এখনকার বদলি-কন্ট্রাক্ট শ্রমিকদের তাও নেই। জুটমিলগুলো পার্মানেন্ট শ্রমিকদের সংখ্যা ক্রমশ কমিয়ে আনছে, ফলে বদলি-কন্ট্রাক্ট শ্রমিকদের ভাবতে হচ্ছে যে সারাজীবন হয়ত তাকে বদলি-কন্ট্রাক্ট হিসাবেই কাজ করে যেতে হবে। ফলে আজকের চড়া বাজার-দরের যুগে এই বদলি-কন্ট্রাক্ট শ্রমিক-যুবকরা শরীর নিঙড়ে খাটনি করেও পরিবার প্রতিপালন করার মতো যথেষ্ট রোজগার করতে পারে না। ফলে অনেক শ্রমিক-যুবকই বিয়ে করতে গেলেও দুশ্চিন্তায় ভোগে যে বিয়ের পর চলবে কী করে।

এরাই যেন আমাকে ঘিরে ধরে প্রশ্ন করতে থাকে, চাচা, আমাদেরও কি আত্মহত্যাই পরিণতি ? এদের এই প্রশ্নের সামনে একটা অপরাধবোধ আমাকে আচ্ছন্ন করতে থাকে। মনে হতে থাকে যে এই বদলি-কন্ট্রাক্ট শ্রমিক-যুবকদের দুরবস্থার দায় কি আমাদের মতো প্রবীণ শ্রমিকদেরও কিছুটা নেই ? পার্মানেন্ট প্রথাকে সংকুচিত করতে করতে বদলি-কন্ট্রাক্ট প্রথাকে মালিক-ম্যানেজমেন্ট যে

সময়পর্যায় জুড়ে এভাবে কায়েম করল, সেই সময় পর্যায়ে আমাদের মতো আজকে প্রবীণ হয়ে যাওয়া শ্রমিকরাই তো কারখানায় কাজ করেছি, আমরা কেন মালিক-ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে একে আটকাই নি? অনেক প্রবীণ শ্রমিকই হয়ত বলবেন, দোষটা আমাদের নয়, দোষটা সব বেইমান গাদ্দার ট্রেড-ইউনিয়নগুলোর যারা শ্রমিকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে মালিকদের মোসায়েবি করেছে, শ্রমিক-আন্দোলনকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয় নি। আমার মনে হয় যে একথা একশো শতাংশ ঠিক যে ট্রেড-ইউনিয়নগুলো গাদ্দারি করেছে, শুধু তাই নয়, যে সব রাজনৈতিক পার্টিগুলোর উপর শ্রমিকরা ভরসা করতে চেয়েছে, তারাও শ্রমিকদের ঠকিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রমিকদের কি কিছুই করার ছিল না? গাদ্দারদের চিনে নিয়ে তাদের থেকে আলাদাভাবে আমরা শ্রমিকরা কি সমস্ত শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করতে লড়াই করার জন্য নিজেরা জোট বাঁধার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছি? আমরা যারা পার্মানেন্ট শ্রমিক ছিলাম, তারা কি বদলি-কন্ট্রাক্ট শ্রমিকদের সমস্যাকে সমস্ত শ্রমিকদের সমস্যা হিসাবে দেখে তা সমাধানের পথ নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছি? পিছন ফিরে দেখলে মনে হয়, না, করি নি। এইখানেই তেইশ বছরের দীপক দাসের আত্মহত্যা আমাকে অপরাধী চিহ্নিত করে যায়।

এ অপরাধের গ্লানি নিয়েই আজকে যারা আমাকে চাচা বলে, সেই বদলি কন্ট্রাক্ট শ্রমিক-যুবকদের বলতে চাই যে আত্মহত্যা নয় বাপ, আমাদের পথ সমস্ত শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য একজোট হয়ে লড়া, গাদ্দার-বেইমানদের চিনে নেওয়া— সে পথে এগো বাপ, তোদের এই বুড়ো চাচাও তোদের সঙ্গে থাকবে।

–শ্রমিকদের হাতিয়ার, অক্টোবর ২০১৪

মাদ্রাসা, মুসলমান সমাজ ও জঙ্গিযোগের অভিযোগ

বাংলা ভাষায় একটা প্রবাদ আছে– "যত দোষ,নন্দ ঘোষ"। এখন যা অবস্থা তাতে নন্দ ঘোষ নামটা পাল্টে না নন্দ মোল্লা হয়ে যায়! মহামহিম নেতা, আমলা থেকে শুরু করে দূরদর্শন ও সংবাদপত্রের সবজান্তা বিশেষজ্ঞরা সবাই এখন সমাজের যে কোন দুরাচার-অনাচারের পিছনে মুসলমানদের হাত দেখতে শুরু করেছেন! সবাই মিলে এমন রব তুলছেন যে মাদ্রাসায় মাদ্রাসায় ভয়ংকর সব রক্তখেকো সন্ত্রাসবাদীরা ছোটদের মাথা খেয়ে সন্ত্রাসের হাতিয়ার হিসাবে গড়ে তুলছে, আর তারপর সন্ত্রাসের নকশা ছকে নিরপরাধ মানুষের জান নিতে লেলিয়ে দিচ্ছে! এইসব নেতা-আমলা-বিশেষজ্ঞদের প্রভাব-প্রতাপ এত বেশি যে তাঁদের যৌথরবের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা খুব কষ্টসাধ্য। তবু, তাঁদের জ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন না তুলে থাকা যায় না। কারণ, মুসলমান বলেই সন্ত্রাসবাদী বা সম্ভাব্য সন্ত্রাসবাদী পরিচয় নিয়ে ঘুরতে হবে, তা তো আর মানা যায় না! তাই, যাঁরা আজ সবজান্তার ভেক ধরে মুসলমানদের 'আসল পরিচয়' (অর্থাৎ, সন্ত্রাসবাদী পরিচয়) বে-পরদা করতে উঠেপড়ে লেগেছেন, তাঁরা যে আসলে মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে কত কম জানেন তা নিয়ে কিছু কথা বলা একান্তই দরকার।

সবজান্তাবাবুরা কি জানেন যে মাদ্রাসাগুলোতে কারা পড়ান, কী পড়ানো হয়, আর কারা পড়েন ?

মাদ্রাসাগুলোয় মূলত আরবি ভাষায় শিক্ষাদান করা হয়, তার সঙ্গে কিছু ইসলামিক ইতিহাস, কিছুটা দর্শন, আর তার সঙ্গে ইংরেজি ও গণিতেরও কিছু পাঠ দেওয়া হয়। এটা যদি জানা থাকে, তাহলে যেকোনও মাদ্রাসাতে তল্লাশি চালালেই যে আরবি ভাষায় লেখা কিছু পুঁথি, কোরান শরিফের কিছু কপি, কিছু আরব-ইতিহাসের বই পাওয়া যাবে স্বাভাবিকভাবেই, তা বুঝতে তো বিশেষ কোনও বিচক্ষণতার প্রয়োজন হয় না। অথচ, সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গের কিছু মাদ্রাসায় তল্লাশি চালিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের মহামহিম গোয়েন্দাদল এইসব

পেয়েই শিউরে উঠলেন এবং সিদ্ধান্ত করলেন যে এইসব পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগের নিশ্চিত প্রমাণ! মহামহিমগণ, বিচক্ষণতার জোব্বার তলায় এ কী নির্বুদ্ধিতার প্রকাশ!

এই বঙ্গের যত খারেজি মাদ্রাসা, তা কীভাবে চলে সে সম্পর্কে কি কোন খোঁজখবর রাখেন, মহামহিমগণ ? এই মাদ্রাসাগুলো মূলত ভিক্ষাবৃত্তির উপর চলে। কিছু মাদ্রাসার শিক্ষক দুই-চারজন বাচ্চা পড়ুয়াকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে চাঁদা তোলেন। তাতে বেশ কিছু অনাথ ও দুঃস্থ পরিবারের সন্তানের পড়া ও প্রতিপালন চলে। আপনাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা যেসব বাজার-আলো-করা নামী-দামী স্কুলে পড়ে, সেই সব-পেয়েছির-জগৎ থেকে এই বঞ্চিত-লাঞ্ছিত-দের জগৎ লক্ষ যোজন দূরে। এখানকার শিক্ষকরা শ্রমিক-মজুরদের থেকেও কম রোজগার করেন। আর ছাত্ররা ? মাদ্রাসায় পাঠ শেষ হলে গতর খাটিয়ে রোজগারের ধান্দাতেই তাদের জীবন মাটি হয়ে যায়। সে ধান্দায় কাউকে ছুটতে হয় দেশ-গাঁ ছেড়ে বহু দূরে— লেবার-কন্ট্রাক্টরদের প্রতিশ্রুতির মরীচিকার পিছনে দূর কোন আরব দেশে— আর সেখানে মুসলমান বলে তাকে তোয়াজ করা হয় না, বরং অচেনা বিদেশ-বিভুঁইয়ে তার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাকে শুষে ছিবড়ে করে দেয়। এই জীবনজ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে যদি তার বিক্ষোভ জ্বলে ওঠে, যদি কোনও চরমপন্থী সংগঠনের কথা তখন তার মনে ধরে, তাহলে তা এইজন্য নয় যে সে মুসলমান, তা এইজন্য যে আপনারা মহামহিমরা যে সমাজের দণ্ডমুন্ডের কর্তা হয়ে বসে আছেন, সেই সমাজ তাকে বঞ্চনা ও নিপীড়ন ছাড়া আর কিছুই দেয় নি। নিজেদের এই অক্ষমতাকে না দেখে আপনারা আবার তার গায়েই সন্ত্রাসবাদীর তকমা লাগিয়ে তার উপর আরো নিপীড়নের বন্দোবস্ত করছেন— এ আপনাদের কেমন বিচার, মহামহিমগণ ?

ছোট মুখে আর একটা বড় কথা বলে ফেলি, মাফ করে দেবেন হুজুরেরা। এই দেশের প্রজাতন্ত্র দিবস নিয়ে আপনাদের মহোৎসবে তো ঘটা করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামাকে নিয়ে এসে নানা আদিখ্যেতা করলেন। তো এই ওবামাদের মার্কিন সরকারই তো বিভিন্ন সময় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে সেখানে সামরিক হামলা চালিয়েছে, জনগণের আকাঙ্খার বিরুদ্ধে পুতুল সরকার বসিয়ে রেখেছে সন্ত্রাসের জোরে, আবার প্রয়োজন মত পিছন থেকে অস্ত্র ও টাকা জুগিয়ে ধর্মীয় মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদী দলের (সেই আল কায়দা থেকে আজকের আই এস অবধি) জন্ম দিয়েছে। কেমন আপনাদের

বিবেক যে সেই মার্কিন সরকারের প্রধানের সঙ্গে গলা-জড়াজড়ি করেন আর মুসলমানদের গায়ে সন্ত্রাসবাদীর ছাপ্পা মারেন ?

আর একটা কথা না বললে নয়। আপনারা প্রচার করে করে এমন একটা ধারণা দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন যে মুসলমান মানেই ধর্মীয়ভাবে গোঁড়া, এককাট্টা, আর অসহিষ্ণু। আপনাদের বাজারি ভাষণ থেকে শুরু করে পণ্ডিতি লেখা— সবখানেই এইরকম। এইটা যদি আপনারা সত্যিই মনে করে থাকেন, তাহলে বলতে হয় যে সমাজ-ইতিহাস আপনারা কিছুই জানেন না। সমাজ-ইতিহাস এইটা বলে না যে মুসলমানরা সবাই ধর্মীয়ভাবে গোঁড়া আর এককাট্টা। মুসলমানদের মধ্যে শিয়া-সুন্নি ভাগ তো আছেই, তা ছাড়াও আছে আহমদিয়া, সুফি ইত্যাদি নানা গোষ্ঠী, যাদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে নানা বিভেদ-বিতর্ক আছে, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও বিভিন্নতা আছে। সবাই মোটেও ধর্মীয় মৌলবাদী নয় এবং এই বিভেদ-বিভিন্নতাকে ঘিরে ইতিহাসে নানা বড় বড় ঘটনাও ঘটে গেছে। এই গোটা সমাজ-ইতিহাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনারা ধূর্ত মিথ্যাবাদীর মতো যেভাবে মুসলমান সমাজ সম্পর্কে একটা মিথ্যা ছবিকে সত্যি বলে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন, যেভাবে সমস্ত অ-মুসলমানদের কাছে এমনটাই সাব্যস্ত করতে চাইছেন যে মুসলমানরা একজোটে অন্যদের ধর্ম-সংস্কৃতি-জীবনের উপর সন্ত্রাস-আক্রমণ চালাতে উদ্যত, তার পিছনের কারণ কী ? তার পিছনের কারণ মনে হয় এইটাই যে আপনারা সাধারণ মানুষের মনে ভাগাভাগি করে, একে অপরের বিরুদ্ধে ভয় ঢুকিয়ে, নিজেদের রক্ষাকর্তা হিসাবে দেখাতে চান। আর রক্ষাকর্তার জোব্বা পড়ে যুদ্ধ-হিংসা-সন্ত্রাসের অস্ত্রে নিজেদের আধিপত্য কায়েম রাখতে চান।

যাই হোক, মহামহিমগণ, ঢেঁকি যেমন স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, তেমনই আপনারাও তো আপনাদের এই কাজকর্ম সব চালিয়েই যাবেন। সুতরাং আপনাদের কোনও অনুরোধ-উপরোধ করার বা উপদেশ দেওয়ার মত বেওকুফি করার ইচ্ছা আমার নেই। আমার চিন্তা আমার মত খেটে-খাওয়া মুসলমান, অ-মুসলমান সমস্ত 'ইতর' মানুষদের নিয়ে। আমরা ইতর মানুষরা যত একে অপরের বিরুদ্ধে সন্দেহ-অবিশ্বাসের জালে জড়িয়ে পরস্পর-বিরোধী গোষ্ঠীতে ভেঙে যাব, ততই আমাদের উপর মহামহিমদের শোষণ-অত্যাচারের ফাঁস আরও এঁটে বসবে। দুঃখের কথা এইটাই যে মুসলমানদের সম্পর্কে যে মিথ্যা প্রচার চলছে তাতে এই ঘটনাটাই হচ্ছে। মুসলমানরা ক্ষোভে-আশঙ্কায় আরও

নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে যাচ্ছে, ছোট ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে নিজেদের বেঁধে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে, অ-মুসলমানদের প্রতি সন্দেহ-অবিশ্বাস বাড়ছে। আর অন্যদিকে অ-মুসলমানরাও আরো বেশি বেশি করে মুসলমানদের সম্পর্কে সমস্ত বিদ্বেষমূলক মিথ্যা প্রচারকে সত্যি ধরে নিয়ে আরও সন্দেহ-অবিশ্বাসের চোখে মুসলমানদের দেখছে। মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে সামাজিক মেলামেশা, সহৃদয়তা ক্রমশঃ কমছে, আর তা পারস্পরিক সন্দেহ-অবিশ্বাসকে আরও বাড়ার জায়গা করে দিচ্ছে। এভাবেই চক্রাকারে চলছে। আর এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে, পারস্পরিক সন্দেহ-অবিশ্বাস-আতঙ্ককে আরও চাগিয়ে দিয়ে ঘোলা জলে মাছ ধরে নিতে চাইছে ধর্মের ব্যবসাদাররা আর তাদের বড় গোঁসাই বি জে পি-র মত পার্টি। আমাদের মেহনতী মানুষদের রুটি-রুজি-বেঁচে থাকার লড়াই পড়ে যাচ্ছে আরও বিশ বাঁও জলে।

তাই আমার আবেদন আমার মত ইতর মানুষদের কাছেই। আমরা কি সচেতন থাকতে পারব না যে মুসলমানদের সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে, আমরা কি পারব না এই মিথ্যা প্রচারে না ভুলতে ? পরস্পরের দিকে সন্দেহ-অবিশ্বাসের চোখে না তাকিয়ে আমরা যদি আমাদের নিজেদের মধ্যে সামাজিক মেলামেশা বাড়াতে পারি, ছোট ছোট আলাদা গোষ্ঠীর মধ্যে আটকে না যাই, একে অপরের সুখে-দুঃখে উৎসবে-বিপদে ছুটে যেতে পারি, তাহলে ধীরে ধীরে আমরা নিশ্চয়ই নিজেদের মধ্য থেকে মুছে ফেলতে পারব পরস্পর সম্পর্কে অস্বস্তি-অবিশ্বাসগুলোকে। সেইটাই যে এখন খুব দরকার, নইলে যে আমরা মিথ্যুক-ধাপ্পাবাজদের হাতের খেলার পুতুল হয়ে যাচ্ছি।

–শ্রমিকদের হাতিয়ার, মার্চ ২০১৫

কী নিয়ে হইচই করা হচ্ছে দেশদ্রোহিতা বলে ?

দিল্লির সংসদ ভবনে জঙ্গি হামলার সঙ্গে জড়িয়ে দিয়ে অধ্যাপক আফজল গুরুকে ফাঁসি দিয়েছিল ভারত সরকার। যেভাবে পুলিস কেস সাজিয়েছিল যে জঙ্গি হামলায় ব্যবহৃত গাড়িটি কেনার সঙ্গে আফজল গুরু জড়িত, যেভাবে গোটা বিচারপ্রক্রিয়ায় তাঁর পক্ষ থেকে দাঁড়ানো সরকারি আইনজীবী আশ্চর্যরকম ভাবে নীরব ছিল— এমন আরও অনেক কিছুকে তুলে ধরে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের পক্ষ থেকে বহু দলিল প্রকাশিত হয়েছে এই অভিযোগ তুলে যে আফজল গুরুকে মিথ্যা অভিযোগে প্রাণদন্ড দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি দিল্লির জে.এন.ইউ. বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রসংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে একটি প্রতিবাদসভা সংগঠিত করে এই ফাঁসিকে 'বিচারবিভাগের করা হত্যা' (judicial homicide) আখ্যা দিয়েছিল। সেইসঙ্গে কাশ্মীর ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভারতীয় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যে লাগাতার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস জারি রাখা হয়েছে তার বিরোধিতা করে সেইসমস্ত জায়গায় সংগ্রামরত জাতিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সমর্থন জানিয়েছিল স্লোগানের মাধ্যমে। এই কার্যক্রমকে দেশদ্রোহিতা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা, ভারতবিরোধীদের অনুচরবৃত্তি ইত্যাদি তকমা দিয়ে শাসকদল বি.জে.পি.-র ছাত্রসংগঠন প্রথম রব তোলে এবং তারপর সেই রবকে আরও তীব্র করে তুলে গোটা দেশে দাপাদাপি আরম্ভ করেছে বি.জে.পি. ও সঙ্ঘপরিবারের সমস্ত চ্যালা-চামুণ্ডারা। কেন্দ্রীয় সরকার, পুলিশ ও বিচারব্যবস্থাও তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে একের পর এক দমনমূলক পদক্ষেপ নিয়ে যাচ্ছে, যেমন— জে.এন.ইউ.-র তিন ছাত্রকে গ্রেফতার করা ও দেশদ্রোহিতার অভিযোগ (সেই আইন ব্যবহার করে যা ইংরেজরা তৈরি করেছিল ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামীদের ফাঁসি দিতে বা দ্বীপান্তরে পাঠাতে, যা এখনও ভারতীয় পেনাল কোডে টিকিয়ে রাখা হয়েছে) চাপিয়ে দেওয়া, জে.এন.ইউ.-র

ছাত্রছাত্রীদের সমর্থনে যেখানেই আওয়াজ উঠেছে, সেখানেই চোখ রাঙিয়ে ও দেশদ্রোহিতার তকমা এঁটে তার কন্ঠরোধ করা, ইত্যাদি। শ্রমিক ও মেহনতী খেটে খাওয়া মানুষদের দিক থেকে আমরা বিষয়টিকে কীভাবে দেখব ?

হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের কোনও রায়কে ভুল বলা, পুলিশ- সেনা-আধাসেনা-দের দেশের কোনও অংশে ভূমিকাকে অত্যাচার বা সন্ত্রাস আখ্যা দিয়ে সেই অংশের আন্দোলনকারীদের পক্ষে দাঁড়ানো, দেশের কোনও অঞ্চলের মানুষ যদি আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসে (এমন কি আলাদা হয়ে গিয়ে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রেরও দাবি তোলে) তাকে সমর্থন করা— এইসব কি দেশদ্রোহ ? শাসকদের পক্ষ থেকে এমনটাই বোঝানোর চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু নিজেরা একবার বিবেচনা করে দেখা যাক।

হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের রায়কে ভুল বলার অর্থ সবচেয়ে কম এই হতে পারে যে ব্যক্তি বিচারপতিরা তাঁদের বিবেচনায় ভুল করেছেন, আর সবচেয়ে বেশি এই হতে পারে যে বিচারব্যবস্থাটাই এমন যা সঠিক বিচার দিতে পারে না। প্রথমটি যে হতেই পারে, তা ধরে নিয়েই তো একটা কোর্টের বিচার তার উচ্চতর কোর্টে পুনর্বিচারের জন্য আবেদনের সুযোগ, এমনকি সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রায়ের উপরেও ক্ষেত্রবিশেষে রাষ্ট্রপতির কাছে পুনর্বিচারের জন্য আবেদনের সুযোগ চালু আছে— সেইসব ব্যবস্থাকে নিশ্চয়ই কেউ দেশদ্রোহের ব্যবস্থা বলতে চাইবেন না।

তাহলে সমস্যা কি সেখানে যখন ব্যক্তি বিচারপতিদের ভুল নয়, গোটা বিচারব্যবস্থার গলদ নিয়ে বলা হচ্ছে ? কিন্তু শ্রমিক ও মেহনতী মানুষরা একবার ভেবে দেখুন, আমাদের অভিজ্ঞতা কী বলছে। মালিকরা টাকার জোরে বড় বড় উকিল নিয়োগ করে বহুদিন পর্যন্ত এক কোর্ট থেকে আরেক কোর্টে মামলা টেনে নিয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে শ্রমিক বা মেহনতী মানুষদের সেই টাকার জোর নেই— ফলে প্রথম দফায় কষ্টেসৃষ্টে টাকা জোগাড় করে মালিকের বিরুদ্ধে আইনী লড়াইয়ের উদ্যোগ নিলেও মামলার খরচ চালাতে না পেরে অচিরেই রণে ভঙ্গ দিতে হয়। মোটা টাকায় উকিল না পুষতে পারলে কেন বিচার চাওয়া যাবে না ? বিচারপতি-জজেরা তো সব আমাদেরই দেশের লোক, তাহলে উকিলদের লাতিনে-ইংরাজিতে মেশানো খটমট জড়ানো-প্যাঁচানো আপিল-পদ্ধতি কেন বিচারের জন্য জরুরি হবে, কেন আমরা সাধারণ মানুষরা আমাদের মুখের ভাষায় কোর্টে দাঁড়িয়ে বিচার চাইতে পারব না— তাহলে তো উকিলের ফি গোনার চাপ

থাকে না, আমাদের মতো মানুষজন তাদের কথাটাও খোলামেলাভাবে হাজির করতে পারে।

সুতরাংপয়সাওয়ালা অভিজাতরা বড়তি সুবিধা পায় যেই বিচারব্যবস্থায় তাকে ভুল বললে, তার বদলে আমজনতার সুবিধা হবে এমন বিচারব্যবস্থা দাবি করলে, তা দেশের বেশির ভাগ মানুষের স্বার্থের পক্ষেই তো দাঁড়ানো হয়। আর আমাদের তো সেটা চাওয়াই স্বাভাবিক।

এরপর তাহলে দেখা যাক পুলিশ-সেনা-আধাসেনাদের ভূমিকাকে অত্যাচার-সন্ত্রাস বলা আর আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে আন্দোলনরত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষকে সমর্থন করার ব্যাপারটা। কাশ্মীরে এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে ভারত সরকার চাপিয়ে রেখেছে সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন (আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট), যার বলে সেনা-আধাসেনারা ওই সমস্ত জায়গায় শুধুমাত্র জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহেই যে কোনও কাউকে গ্রেফতার করে বিনা বিচারে আটকে রাখতে পারে, বা গুলি করে মেরে ফেলতে পারে, বা যে কোনও বাড়িতে যে কোনও সময় বিনা-ওয়ারান্টে তল্লাশি-ধরপাকড় চালাতে পারে। এই আইনকে ঢাল করে কাশ্মীরে ও উত্তর-পূর্ব ভারতে পুলিশ-সেনা-আধাসেনা যে কতো যুবক-যুবতীদের হাপিশ করে দিয়েছে, যুবতীদের ধর্ষণ করেছে, আদিবাসী-উপজাতিদের গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে তা গুনে শেষ করা দুষ্কর। শ্রমিক-মেহনতীদের তো মনে আছে লড়াকু শ্রমিক ভিখারি পাসোয়ানকে পুলিশের গায়েব করে দেওয়ার কথা— ভাবুন তো, তার কয়েক গুন বেশি সন্ত্রাস যদি দিনের পর দিন লাগাতার চলতে থাকে বছরের পর বছর, তাহলে তার বিরোধিতা করবেন, না কি তা দেশপ্রেমিকদের দেশভক্তির প্রকাশ বলে বন্দনা করবেন ? বছর পনেরো আগে মনিপুরের বয়স্ক মহিলারা ভারতীয় সেনা বাহিনীর দফতরের সামনে নগ্ন হয়ে "ভারতীয় সেনারা আমাদের ধর্ষণ করো"-লেখা ব্যানার তুলে ধরে যে তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল, তা নিশ্চয়ই মনে আছে। কুড়ি বছরের উপর ধরে মনিপুরের একজন কবি ইরম শর্মিলা চানু যে অনশন করে চলেছেন সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রত্যাহারের দাবিতে তা নিশ্চয় মনে আছে। তাঁদের সহনাগরিকদের প্রতি কতোটা দরদ থাকলে তবে এভাবে নিজেদের এগিয়ে দেওয়া যায়, তা কি আমরা কল্পনা করতে পারি ? তাহলে এঁদের আমরা দেশদ্রোহী বলব আর সরকারের দেওয়া বন্দুক হাতে নিয়ে যে পুলিশ-সেনা-

আধাসেনারা সহনাগরিকদের নির্বিচারে খুন করে চলেছেন তাদের দেশপ্রেমী বলব কী করে ?

কাশ্মীর ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পুলিশ-সেনা-আধাসেনারা নির্মম সন্ত্রাস জারি রেখেছে সেইখানকার মানুষদের আন্দোলনকে পিষে মারতে। ১৯৪৭-এ কাশ্মীরের মানুষরা স্বেচ্ছায় ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে সামিল হয়েছিল এই শর্তে যে তাদের স্বায়ত্তশাসনের কিছু কিছু অধিকার স্বীকৃত হবে এবং কয়েক বছরের মধ্যে গণভোটের মাধ্যমে তাদের বেছে নিতে দেওয়া হবে কীভাবে তারা থাকতে চায়— ভারতের সঙ্গে, পাকিস্তানের সঙ্গে না স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে। কিন্তু তার পর থেকেই ভারতীয় রাষ্ট্র তাদের উপর গাজোয়ারি-দাদাগিরির মনোভাব নিয়ে চলেছে— একের পর এক তাদের স্বায়ত্তশাসনের সমস্ত অধিকারকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, গণভোট হতে দেওয়াই হয় নি। আজ অবধি যেকয়টা নিরপেক্ষ সমীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে, তার সব কটাতেই দেখা যাচ্ছে যে কাশ্মীরের মানুষের বিপুল সংখ্যাধিক অংশ ভারতের সঙ্গেও নয়, পাকিস্তানের সঙ্গেও নয়, নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র চাইছে— ভারতীয় শাসকরাই তাদের দাদাগিরির মনোভাব দিয়ে তাদের এইদিকে ঠেলে দিয়েছে। কাশ্মীরের মানুষদের এই চাওয়ার মধ্যে অন্যায় কী আছে— ব্রিটেনের মধ্যে স্কটল্যান্ডের লোকেদের আলাদা রাষ্ট্রগঠনের দাবি নিয়ে যদি গণভোট হতে পারে, স্পেনের মধ্যে কাতালোনিয়ার মানুষদের এবং কানাডার মধ্যে ক্যুবেকের মানুষদেরও যদি একই দাবিতে গণভোট চলতে পারে, তবে কাশ্মীরের মানুষদের ইচ্ছা নিয়ে গণভোট হবে না কেন ও সেখানকার মানুষদের সংখ্যাধিকের ইচ্ছাকে মান্যতা দেওয়া হবে না কেন ? কেন সেনা-আধাসেনার সন্ত্রাস দিয়ে সেখানকার মানুষের ইচ্ছাকে রক্তগঙ্গায় ডুবিয়ে রাখাকে দেশপ্রেম বলা হবে ? দেশের মানুষকে মেরে এ কোন্ দেশপ্রেম ? একইভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন আদিবাসী-জনজাতি গোষ্ঠীর তাদের নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় স্বশাসনের অধিকারকে পদদলিত করছে ভারতীয় রাষ্ট্র সেনা-আধাসেনা-পুলিশের হাতে অবাধ সন্ত্রাস চালানোর ছাড়পত্র তুলে দিয়ে। দেশের মানুষদের প্রতি সহনাগরিকের সম্মানটুকু দিতে হলেও তো আমাদের আদিবাসী-জনজাতি গোষ্ঠীর স্বশাসনের অধিকারের পক্ষেই দাঁড়াতে হবে, বিরোধিতা করতে হবে বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রের।

তাই এখন যেভাবে সবকিছুকে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, তার থেকে ঠান্ডা মাথায় আমাদের কিছু কিছু বিষয়কে আলাদা করতে হবে। দেশদ্রোহিতা,

অর্থাৎ দেশের বিরোধিতা বলে তার মধ্যে গুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিচারব্যবস্থার খামতির বিরোধিতা, পুলিশ-সেনা-আধাসেনা দিয়ে চালানো সন্ত্রাসের বিরোধিতা, সরকারকে ব্যবহার করে শাসকগোষ্ঠীর দেশবাসীর অধিকারকে কেড়ে নেওয়ার বিরোধিতা। ওই মামলা-হামলা-আমলা (বিচারব্যবস্থা-পুলিশ ও সেনা-সরকার) নিয়ে দেশ-শাসনের যে অস্ত্র তাকেই দেশ বলে চালানোর চেষ্টা হচ্ছে। অস্ত্র ঠিকমতো কাজ না করলে তাকে পাল্টাতে হয়। বর্তমানে দেশ চালোনোর যে অস্ত্র আছে তা যদি দেশের ব্যাপক মানুষের অধিকারগুলোর স্বীকৃতি না দিয়ে সন্ত্রাসে চুপ করিয়ে রাখার চেষ্টা করে, তবে দেশ চালানোর এই অস্ত্র ঠিকমতো কাজ করছে না। যে স্বপ্ন নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রাণ বাজি রেখে লড়ে স্বাধীনতা আদায় করার চেষ্টা হয়েছিল, সেইরকম একটা প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজে তা ব্যবহার করে পৌঁছানো যাচ্ছে না। ফলে অস্ত্র পাল্টানোর কথা তো আমাদের ভাবতেই হবে। সবদিক থেকেই এই রাষ্ট্রের সমালোচনা করে, তার খুঁত ও ভুলগুলোকে চিহ্নিত করে, এই রাষ্ট্রের বিরোধিতা করতে হবে। একে সরিয়ে এমন এক দেশ-চালোনোর উপায় ভাবতে হবে, যা একটা প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজে আমাদের পৌঁছে দিতে পারে। দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি দরদ থাকলে সেইটাই এখন কাজ— তা রাষ্ট্রদ্রোহিতা (বর্তমান জুলুমবাজির রাষ্ট্রের বিরোধিতা অর্থে) হতে পারে, কিন্তু দেশদ্রোহিতা নয়, বরং সেটাই আসলে দেশের প্রতি দরদ। যারা আজকে এইসব গুলিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহিতাকে দেশদ্রোহিতার সমার্থক করে দিতে চাইছে, হয় তারা বর্তমান জুলুমবাজির রাষ্ট্রকে যে কোনওভাবে হোক নিজেদের স্বার্থপূরণের জন্য টিকিয়ে রাখতে চাইছে, আর নয়তো পথভ্রান্ত হয়ে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার নিশানা হারিয়ে ফেলেছে। আমাদের শ্রমিক ও মেহনতী মানুষদের তো এই কোনওটা করলেই বর্তমান জীবন বা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ক্ষমা করবে না। তাই কে আমাদের গায়ে দেশদ্রোহের মিথ্যা তকমা লাগিয়ে দেবে সেই ভয়ে গুটিয়ে গেলে হবে না, প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজের দিকে এগোনোর পথ খুঁজে নিতে হবে।

–শ্রমিকদের হাতিয়ার, মার্চ ২০১৬

নির্বাচন ও কয়েকটি কথা

আবার একটা নির্বাচন এসে গেল। বিগত সরকারগুলোর মতো এবারও শাসকদল নিজেদের কৃতিত্বের কথা দৈনিক সংবাদপত্রে, বড় বড় হোর্ডিংয়ে ফলাও করে প্রকাশিত করে চলেছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোও যথারীতি শাসকদলের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অভিযোগ তুলে চলেছে আর পারস্পরিক কাদা-ছোঁড়াছুঁড়িতে নিজেদের জাত চিনিয়ে দিচ্ছে।

আমাদের শ্রমিকদের সামনেও প্রশ্ন উঠে গেছে— ভোট দেবে কাকে ? কোন পক্ষে তুমি ? এখন ঝামেলাটা এখানেই যে নাগরিক হিসাবে এই দেশের শ্রমিকরা তাদের ভোটাধিকার তো কম প্রয়োগ করে নি, ভোটের লড়াইয়ে পক্ষও তারা কম বাছে নি। তারা কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে, বি জে পি-কে ভোট দিয়েছে, বামপন্থীদের ভোট দিয়েছে, তৃণমূলকেও ভোট দিয়েছে। কিন্তু এই কোনও পক্ষই তো তার নিজের পক্ষ হয়ে ওঠে নি। সব পক্ষই ভোটের আগে হাতজোড় করে ভোট চেয়েছে আর ভোটের পর শ্রমিকদের কথা ভুলেই গেছে। সব পক্ষের কাছেই তো গুরুত্বপূর্ণ হল মালিক-পুঁজিপতি-বড়লোকদের ব্যাপার নিয়ে ভাবা— কীভাবে তাদের পুঁজি বাজার থেকে আরও লাভ তুলে নিতে পারে, কীভাবে তারা জমি-জায়গা-জল-জঙ্গল সবকিছুর দখলদারি নিয়ে ব্যবসা আরও জমাতে পারে, স্কুল থেকে হাসপাতাল সব হয়ে উঠতে পারে তাদের ব্যবসার ক্ষেত্র, ইত্যাদি। ফলে শ্রমিকরা তাদের কাছে এক উটকো ঝামেলা বিশেষ— শ্রমিকরা যদি মজুরি বাড়াতে বলে, বা মজুরি কমানো বিনাকথায় মেনে না নেয়, কাজের স্থায়ীত্ব দাবী করে বা বিনাকথায় ছাঁটাই মেনে না নেয়, তাহলে মালিক-পুঁজিপতিরা যে হৈ হৈ করে ওঠে তাদের মুনাফা কমে যাচ্ছে বলে! অসুস্থ শ্রমিকরা যদি বলে যে তাদের চিকিৎসার দায়িত্ব সমাজকে নিতে হবে, যদি বলে যে তাদের পরিবারের শিশুদের শিক্ষার দায়িত্ব সমাজকে নিতে হবে, তাহলে শিক্ষা-স্বাস্থ্য পরিষেবা বিক্রির ব্যবস্থা কায়েম হবে কী করে!

ফলে নির্বাচন শেষ হয়ে গেলে যে রঙেরই দল সরকার গঠন করুক না কেন শ্রমিকদের পাওনা শুধুই চোখরাঙানি— কারখানায় আন্দোলন করতে পারবে না, ধর্মঘট তো কখ্‌খোনো নয়, মালিক-ম্যানেজমেন্টের সব হুকুম মুখ বুজে মেনে নিতে হবে, প্রাণপাত হয় হোক প্রোডাকশন বাড়িয়ে যেতে হবে, ইত্যাদি।

তাই শ্রমিকরা ভোটের লড়াইয়ে যে পক্ষই নিক না কেন, গেরুয়া-সবুজ-লাল যে রঙেই সামিল হোক না কেন, তার জীবন একই রকমের বিবর্ণ বেরঙা হয়ে থাকে— কান্নার কি কোনও রঙ হয় ? ক্ষয় ও হাহাকারের কি কোনও রঙ হয় ? অনাহারে শুকিয়ে মরারই বা রঙ কী ?

চাবাগানের যে ১৬০০ শ্রমিক না খেয়ে মারা গেল বিভিন্ন পার্টি এখন তাদের নিয়ে রঙিন পোস্টার ছাপিয়ে সহানুভূতি দেখিয়ে ভোট চাইছে । হায়! মরার আগে তাদের জীবনের প্রয়োজন মেটানোর কথা কেউ ভাবল না, আর তাদের মৃত্যু ভাঙিয়ে এখন নিজেদের ভোট বাড়াতে চাইছে!

সমস্ত মেহনতীদেরই কি এই এক অবস্থা নয় ? কৃষির ব্যাপারেও তো সবগুলো পার্টি এখন শিরোধার্য করেছে রাসায়নিক সার-বীজ-কীটনাশকের বড় বড় কোম্পানিগুলোর স্বার্থ, বড় বড় কৃষি-ব্যবসায়ীর স্বার্থ। ফলে চাষের খরচ হু হু করে বেড়ে গিয়ে সাধারণ চাষীদের সামর্থ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে, চাষ করতে গিয়ে চাষি বড়মাপের ঋণের জালে জড়িয়ে যাচ্ছে, তা শোধ করতে না পেরে অনেককে আত্মহত্যাও করতে হচ্ছে। অন্যদিকে রাসায়নিক সার-কীটনাশকের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার মাটির উর্বরতাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, জল ও মাটিকে বিষিয়ে দিচ্ছে, উৎপন্ন খ্যদ্যদ্রব্যের মধ্যেও থেকে যাচ্ছে মারণবিষ। ফলে শুধু কৃষকদের সর্বনাশ হচ্ছে না, সর্বনাশ হচ্ছে দেশের মাটির, দেশের জলের, দেশের শস্যের!

দেশের মেহনতী মানুষদের, দেশের মাটি-জলের এই ক্ষতি, এই সর্বনাশ কোনও দলেরই চিন্তায় নেই কারণ বড়লোক-বাবুজনেরা দেশের অবস্থা মাপে জি ডি পি-র অঙ্কে, যা দিয়ে কেবল পুঁজির বাড়া-কমা ও মুনাফার বাড়া-কমাই বোঝা যায়, মেহনতীমানুষ-মাটি-জল-কে বিবেচনার মধ্যেই ধরা হয় না।

ফলে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকার-গঠনের লড়াইয়ে যে কটা পক্ষ আছে, তার কোনও পক্ষই শ্রমিক বা মেহনতী মানুষদের পক্ষ নয়। এই নির্বাচনী লড়াইয়ের বাইরে বা ভিতরে এমন কোনও পার্টি আজ পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতবর্ষে দেখা যাচ্ছে না যারা দেশের শ্রমিকমেহনতী, দেশের মাটি-জল-এর স্বার্থকে প্রতিনিধিত্ব করছে। তাহলে আমরা শ্রমিক-মেহনতীরা কী করব ? আমাদের

কোনও প্রকৃত প্রতিনিধি নেই, তা সত্ত্বেও কেবলমাত্র ভোট দেওয়ার নাগরিক অধিকারটুকু ফলাতে আমাদের স্বার্থের বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও না কোনও একটা দলকে বেছে নেব, আর সেভাবে বিভিন্ন রঙের ভোটব্যাপারীদের পতাকার তলে ভাগ হয়ে গিয়ে নিজেদের মধ্যে অযথা দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে মরব ? ন্যাড়ার কি মাথা ফেটে গেলেও বেলতলায় যাওয়া থামবে না ? না কি ভোটব্যাপারীদের পতাকার তলে নিজেদের ভাগ করে না ফেলে শ্রমিক-মেহনতীদের সবার স্বার্থে সবাই মিলে কিছু করা যায় কিনা তা ভাবব ?

–শ্রমিকদের হাতিয়ার, মার্চ ২০১৬

গপ্পো

সাট্টার ছক বনাম জীবনের ছক: শ্রমিকজীবনের একটি গল্প:

ফাটল

এক যে ছিল রাম। তার একেবারে অন্তরঙ্গ বন্ধু সাম। রাম হলো রামচন্দ্র নস্কর, আর সাম হল সামসুদ্দিন শেখ। দুজনেই পাটকল শ্রমিক, চিভিয়ট জুটমিলের তাঁতে পাশাপাশি কাজ করে। রামের বাড়ি শ্যামপুরের নস্করপাড়ায়, সামের বাড়ি শ্যামপুর শেখপাড়ায়। ঈদের সময় রাম সপরিবারে সামের বাড়ি শিমুই-পরোটা খেয়ে যায়। পুজোয় সামের সপরিবারে রামের বাড়ি নেমন্তন্ন থাকে। দুজনেরই এখন এ শিফট। এগারোটার ভোঁ পড়তে দুজন পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে কারখানা গেট দিয়ে বার হয়।

সামের পা যেন আর চলছে না। না, শরীর তেমন খারাপ কিছু নয়। সকাল থেকে পাঁচঘন্টা গতর-নিঙড়ানির ক্লান্তিও কেবল নয়। গতকালের ঘটনা এখনও তার মাথার মধ্যে জ্বালা ধরাচ্ছে, গা-হাত-পা ভারী করে দিচ্ছে অবসাদে। কী ভাবে যে রাগ মাথায় চড়ে গেল, মোসলেমা বিবির গায়েও হাত তুলে ফেলল! আর মোসলেমা বিবিও যে কেন সামের কোনও কথা বিশ্বাস করতে চাইল না!

*****

মোসলেমাকে কথা শুনতে হয়েছে ছলের মাস্টারের কাছে মাসের টিউশন ফি এখনও না দিতে পারার জন্য। মাস্টার যাচ্ছেতাই বলেছে ছেলের সামনেই, ছেলেও তাই আর এখন পড়তে যেতে চাইছে না। ঘরেও চাল শেষ হয়ে গেছে, পাড়ার দোকান থেকে বাকিতে আনতে গিয়ে সেখানেও মোসলেমাকে মুখঝামটা খেতে হয়েছে। আগের বাকি শোধ না করলে আর ধারে পাওয়া যাবে না বলে সেখান থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে। পাশের আব্বুদের ঘর থেকে কোনমতে একবেলা

চলার মতো চাল সে চেয়ে এনেছে, কিন্তু সেখানেও খোঁটা শুনতে হয়েছে বিস্তর। এসবের পরে সে চেয়ে ছিল পাঁচটার পর সামের বাড়ি ফেরার দিকে, কারণ সেদিন সামের হপ্তা পাওয়ার কথা।

সাম ফেরার পর মোসলেমা টাকা চাইলে সামের মুখ কালো হয়ে যায়। সাম বলে যে হপ্তা হয় নি, কীসব ঝামেলার জন্য বাবুরা হপ্তার দিন পিছিয়ে দিয়েছে। মোসলেমার মনে ফনা তোলে অবিশ্বাস— তাহলে কি আব্বুর বিবি খোঁটা দিয়ে যা বলল তাই-ই সত্যি— সাম কি তাহলে সাট্টার ঠেকে সব বিসর্জন দিয়ে আসছে ? মোসলেমার সন্দেহ-অবিশ্বাস বিলাপ-অভিযোগ হয়ে ফেটে পড়ে: সামের যদি সাট্টাই সব তাহলে ছেলে-বিবিকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে না কেন...। ঠিক এই সময়েই উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল সাম, ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মোসলেমার উপর, হুঁশই ছিল না কীভাবে কোথায় হাত চালাচ্ছে। হুঁশ ফিরেছিল যখন তার আঠারো বছরের পুত্র জাকির এসে তাকে ধাক্কা মেরে মোসলেমার থেকে তফাৎ করে ঘৃণাভরা চোখে তার দিকে তাকিয়েছিল।

*****

কারখানা গেট থেকে বেরিয়ে পুকুরটার পাশ দিয়ে রাম আর সাম হাঁটছিল। রাম হঠাৎ সাট্টার দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে যায়।

সাম বলে, কী হলো রে, খোঁটা মেরিছিস নাকি!

রাম মিচকে হেসে বলে, হ্যাঁ রে, কাল একজন বলেছিল তিগ্গি খেলতে, দশটাকা খেলেছিনু, একবার খোঁজ নে যাই।

সাম দাঁড়ায়, মনে মনে খানিকটা বিরক্তও হয়: শ্লা, নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, তার আবার ঘোড়া রোগ! রামের দেরি হচ্ছে দেখে শাম হাঁক মারে, ও-ওই, তুই আয়, আমি চননু।

সাম আবার ধীরপায়ে বাড়ির পথ ধরে। আবার দুটোর মধ্যে ফিরে আসতে হবে তো।

*****

কাল রাতে কারোরই আর খাওয়াদাওয়া হয় নি। সেই ভাতই পান্তা খেয়ে সাম যখন বেরোচ্ছে, মোসলেমা স্বগোতক্তির মতো বলল যে সে আর আজ কারও কাছে চাল ভিক্ষা করতে বেরতে পারবে না। সাম মনে মনে প্রার্থনা করল, আজ যেন হপ্তাটা হয়ে যায়, তাহলে চাল কিনেই সে বাড়ি ফিরবে।

*****

সাম দুপুর দেড়টায় হপ্তাবাজারে বিশুর চায়ের দোকানের কাছে এসে রামের দেখা পায়। রামকে বলে, চ, বাঁশি পড়ে গেছে।

চায়ের দোকান থেকে উঠে এসে রাম সামের পাশে হাঁটতে শুরু করে। সাম বলে, কী হল রে ?

রাম বলে, দুগ্গিই হয়েছে, দুশো সত্তর পেইছি।

সাম বেশ অবাক হয়ে বলে, অ্যাঁ!

রাম বেশ উৎফুল্ল স্বরে বলে, আজও বলেছে নককা একঘর হবে, তুই খেলবি ?

সাম বলে, নাঃ, হপ্তা হলে চাল কিনতে হবে।

রাম বলে, আরে শালা খ্যাল না, একবস্তা চালের দাম হয়ে যাবে।

সাম কিছুটা দোনোমোনো হয়ে বলে, এখন কোনও টাকা নেই।

রাম বলে, আমি খেলে দিচ্ছি, হপ্তা পেলে দিয়ে দিস।

সাম ভাবে যে হপ্তায় যা পাবে তাতে ছেলের মাস্টারের মাইনে, চোদ্দ দিনের বাজারহাট সব কুলোবে না, রামের হাতযশে যদি আরো কিছু টাকা হয়ে যায়, মোসলেমার সব ক্ষোভ একেবারে মিটিয়ে দিতে পারবে। আবার ভাবে যে টাকাগুলো জলে গেলে সমস্যা আরো বাড়বে, মোসলেমার চোখেও আরো ছোট হবে। সামের দোনোমোনো ভাব কাটাতে রাম বলে, নে, অত ভাবার সময় নেই।

হাঁটতে হাঁটতে তখন তারা সাট্টার দোকানের সামনে চলে এসেছে। রাম দোকানে ঢুকে নিজের নামে একশো টাকা আর সামের নামে একশো টাকা লাগিয়ে আসে। তারপর তারা কারখানায় ঢুকে যায়।

*****

পাঁচটায় বেরিয়ে দুজনেই ছোটে সাত্তার দোকানে। সাম বাইরে দাঁড়ায়। খানিক্ষণ পর রাম থমথমে মুখে বেরিয়ে আসে। সামের বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে, বলে, কিরে, লাগে নি ?

রাম খিস্তি মেরে বলে ওঠে, নাঃ, ছক্কা ফেটেছে।

সাম নীরবে সেদিনই পাওয়া হপ্তার টাকা থেকে একশো টাকা রামের হাতে তুলে দেয়। বাকি যে টাকা পড়ে রইল, তাতে না হবে চোদ্দ দিনের চাল, না হবে ছেলের মাস্টারের মাইনে। মোসলেমার হাতে এ টাকা তুলে দেওয়ার পর কী জবাবদিহি সে করবে! সূর্য তখনও না ডুবলেও সামের চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। সে দেখতে পায় তার সংসারে গভীর ফাটল ধরেযাচ্ছে— সে ফাটলের একদিকে সে, আর অন্যদিকে তার বিবি ও পুত্র। তার জীবনটা যেন জাহান্নামে নির্বাসিত হচ্ছে।

–শ্রমিকদের হাতিয়ার, মার্চ ২০১৫

মস্তান মামা

"জানো দাদা, এবার বোধহয় আমাকে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে।"

রহমতুল্লার মুখে প্রায় আর্তনাদের মতো কথায় চমকে উঠে ওর হাতটা ধরে বলি— "কী যা তা বলছিস! এখানে বস। বল কী হয়েছে।" পুঁটের চা-দোকানের বেঞ্চিতে ওকে টেনে বসাই।

আবার বলি— "বল কী হয়েছে।"

স্বগোতক্তির মতো বলে ওঠে ও— "আর কী হয়েছে— মেয়েটার বিয়ের সময় আমাদের হাজিরাবাবুর কাছে মাইনের কার্ডটা (মাইনে তোলার এ টি এম কার্ড) বন্ধক রেখে তিরিশ হাজার টাকা লিয়েছিনু। এখন হিসাব করে দেখি এক লাখ সাত হাজার টাকা সুদ লিয়েছে বাবু, তাও শোধ হচ্ছে না।"

"অ্যাঁ— বলিস কী রে—" আবার চমকে উঠি, বলি, "বাবুকে সুদটা ছাড়ার কথা বলতে পারিস নে ?"

রহমতুল্লা আবার বলে, "বলি নি আবার— শালার পায়ে ধরেছি, তবু সুদ ছাড়ে নে। বারোদিন কাজ করলে যা হপ্তা পাই, তার থেকে চার-পাঁচশো টাকা দিয়ে বাবু সব টাকাটাই কেটে লেয়। হপ্তার তিন-চার দিন চলে, বাকিদিন অনাহারে শুকিয়ে দিন কাটে। রোজ অশান্তি সংসারে— বৌয়ের সাথে ঝগড়াঝাটি। মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে দাদা। কী যে করব ভেবে পাচিচ নে।"

সবকথা শুনে সারা শরীর রাগে গনগনে হয়ে ওঠে। বাইরে প্রকাশ না করে রহমের হাতটা ধরে বলি, "চল্— কোন্ বাবু শুধু তুই দেখিয়ে দিবি।"

রহমতুল্লা উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাত ধরে বলে, "তুমি বলবে দাদা আমার হয়ে..."

ওকে থামিয়ে বলি, "আর কথা বলিস নে। চল্, বাবুকে দেখিয়ে দে।"

দুজনে অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা হলুম। কারখানায় ঢুকে লেবার অফিসের দরজায় থমকে দাঁড়িয়ে রহমতুল্লা ইশারায় বাবুকে দেখিয়ে দেয়।

আমি বিরক্ত হয়ে বলি, "দাঁড়ালি কেন— চল্ বাবুর সামনে।"

বাবুর সামনে দাঁড়িয়ে বাবুর চোখের উপর চোখ রেখে বলি, "রহমতুল্লার সুদ আর কাটবে না।"

বাবু থতমত খেয়ে চিৎকার করে ওঠে— "তুই— তুই কে ?"

ঠান্ডা হিস্‌হিসে গলায় বলে উঠি, "আমি কে জানার দরকার নেই। আর কোনও কথা নয়। এর সুদ আর কাটবে না। কাটলে..." বাকি কথাটা চাউনি দিয়ে বলে আর সেখানে দাঁড়াই নি। রহমতুল্লাকে নিয়ে অফিসের বাইরে বেরিয়ে এসে বলি, "যা, তোর ডিপার্টে যা।" তারপর আমিও আমার ডিপার্ট ব্যাচিং সেকশনে ঢুকে যাই।

রহমতুল্লা আমার সিফট্-এ ফুকোনলিতে কাজ করে, বাড়ি শ্যামপুরের বেলডাঙায়। এই ঘটনার দিনতিনেক পর শ্যামপুর মোড়ে আমার সাথে ওর আবার দেখা। হেসে হেসে ও আমার দিকে এগিয়ে এসে হাত ধরে বলে, "চলো দাদা, চা খাই।"

আমি হেসে বলি, "দুর্‌র্ শালা, কী হল আগে বল।"

রহমতুল্লা হেসে বলে, "সুদ কাটে নে, পুরা হপ্তা দিয়েচে। উফ্, এই দেড় বছর যে কীভাবে দিন কেটেছে কী বলব তোমায়! চলো, চলো, চায়ের অর্ডার দেওয়া হয়ে গ্যাছে।"

অগত্যা চা-দোকানে বসে পড়ি। তারপর রহমতুল্লা বলে, "জানো, তুমি চলে যেতে বাবু ডিপার্টে তেড়ে গিস্‌লো।"

আমি জিগ্যেস করলাম, "কী বলল গিয়ে ?"

"বলে, শালা চোদ্দ নম্বর বস্তির মস্তান ধরে এনেছিস ?"

আমি হেসে বলি, "তা, তুই কী বললি ?"

"আমি বললুম, ধুস্, ও মস্তান কুথা, উ তো মোর মামা।"

"অ্যাঁ," হা হা করে হেসে উঠে বলি, "তা তুই একেবারে বাপের শালা করে ছাড়লি ?"

রহমতুল্লাও হেসে ওঠে।

–শ্রমিকদের হাতিয়ার, মার্চ ২০১৬

বিপন্ন কোরাস

খবরটি শুনে আমি অবাক হই নি কারণ বরুণদা যে পথে হাঁটছিলেন, তাতে যে এমনটি হবে সে আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম।

ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল যখন বামপন্থী, কংগ্রেস বা টি এম সি-র ইউনিয়নগুলোকে দীর্ঘদিন ধরে বলেও তারা কিছু না করায় বেশ কিছু বঞ্চিত রিটায়ার শ্রমিক বরুণদার কাছে এসেছিলেন। শ্রমিকদের বঞ্চিত হওয়ার তো শেষ নেই, তবে এই শ্রমিকদের ক্ষোভ ছিল গ্র্যাচুইটির পাওনা নিয়ে।

এঁদের প্রত্যেককেই রিটায়ারের পরও সংসার চালানোর তাগিদে দীর্ঘদিন গ্র্যাচুইটি না পেয়ে মাথা নিচু করে কম মজুরিতে কারখানায় কাজ করে যেতে হয়েছে। হিসাববাবুদের হিসাবের গেরোয় পি এফ পেনশন তো মিলছে মোটে হাজার বা এগারোশো টাকা— তাতে কি আর সংসার চলে! ফলে, কবে গ্র্যাচুইটির লিস্টে তাঁদের নাম ওঠে সেইদিকে তাকিয়ে দীর্ঘ ৩৫/৪০ বছর ধরে কারখানায় নিঙড়ানি খাওয়া দেহটাকে আবার টেনে এনে দম নিঙড়ে কাজ করে যাচ্ছিলেন। এরপর যখন গ্র্যাচুইটি পেলেন, তখন কেউ পেলেন তিরিশ-চল্লিশ হাজার, কেউ বা বড়জোর এক লাখ। কিন্তু হিসাবমতো এঁদের প্রাপ্য গ্র্যাচুইটি দুই লাখের কম নয়। শেষ জীবনের শেষ সম্বলটাতেও মালিক-ম্যানেজমেন্ট এইভাবে থাবা বসানোয় এঁদের চোখের সামনে আশার শেষ দীপটিও নিভে যাচ্ছিল। কেউ ভেবেছিল গ্র্যাচুইটির টাকা পেলে মেয়ের আটকে-থাকা বিয়েটাকে পার করে দেওয়া যাবে, কেউ ভেবেছিল তা দিয়ে ছেলেটার কোনও রোজগারপাতির ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে— এখন সেসবই বহু বহু দূরের ব্যাপার হয়ে গেছে। বরুণদার কাছে আসা শ্রমিকদের ক্ষোভ এই নিয়েই।

বরুণদাও রিটায়ার শ্রমিক। রিটায়ারের পর তিনিও কারখানায় কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর গ্র্যাচুইটির টাকাও আটকে আছে। বছর কুড়ি আগে কারখানায় একটা উদ্‌যোগ উঠেছিল— মালিকদের দালাল ও পার্টির ধামাধরা

ইউনিয়নগুলোকে ছেড়ে সংগ্রামী একটা ইউনিয়ন তৈরি করার উদযোগ। সেই উদ্‌যোগে বরুণদা ছিলেন সামনের সারিতে। সব শ্রমিকরা এককাট্টা হতে না পারায় ম্যানেজমেন্ট ও তার দালাল নেতাদের গা-জোয়ারিতে সে উদ্‌যোগ শেষ অবধি ভেস্‌তে গেলেও, বরুণদা মাথা নোয়ান নি। হক কথা বলা, ম্যানেজমেন্ট বা তার দালালদের রেয়াত না করার অভ্যাস তাঁর মজ্জাগত।

ছয়-সাতজন শ্রমিক তাঁদের ক্ষোভ নিয়ে যেদিন বরুণদার বাড়ি আসে, বরুণদা সেদিন সবাইকে নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন। আলোচনায় অন্য আর কোনও পথ না দেখে তাঁরা ঠিক করেন যে কোম্পানির বিরুদ্ধে গ্র্যাচুইটির কোর্টে তাঁরা মামলা করবেন ন্যায্য পাওনার দাবিতে। বরুণদাই তারপর ছোটাছুটি করে সব ব্যবস্থা করে দেন।

কোম্পানির পেটোয়া লোক মারফত কর্তৃপক্ষ জানতে পারে যে বরুণই এই কেসগুলো করার মূলে। তাই বরুণদাকে অফিসে ডেকে গ্র্যাচুইটির চেক ধরিয়ে দিয়ে বলে যে আর আসতে হবে না। কোম্পানির করা গ্র্যাচুইটির হিসাবের সাথে বরুণদার হিসাব মেলে না— প্রাপ্য গ্র্যাচুইটির অর্ধেকেরও কম হিসাব করেছে কোম্পানি। বরুণদা নিজের করা হিসাব পারসোনাল ম্যানেজারের টেবিলে ফেলে বলেন যে কোম্পানির হিসাব ভুল আছে, তা ঠিক করতে। পারসোনাল ম্যানেজার অবজ্ঞার হাসি হেসে বলে — কোম্পানির হিসাব নির্ভুল, আপনি কোর্টে কেস করতে পারেন। বরুণদা রাগে গরগর করেন— আপনার সুপরামর্শের জন্য ধন্যবাদ, আগামীদিনে কোর্টেতেই দেখা হবে। এই বলে বরুণদা শেষবারের মতো কারখানা থেকে বেরিয়ে আসেন।

****

বরুণদা পি.এফ.-এর যে টাকা পেয়েছিলেন তা বড় মেয়ের বিয়ে দিতেই ফুরিয়ে গিয়েছে, উল্টে দশ হাজার টাকার মতো ধার বাজারে। তাই রিটায়ার হওয়ার পরও বাধ্য হয়েই নিয়মিত কারখানায় কাজ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু শ্রমিকদের এতো বঞ্চনা তাঁকে অস্থির করে তোলে। তাই গ্র্যাচুইটি কমিশনারের কাছে এর আগেও তিনজনকে নিয়ে গিয়ে ন্যায্য গ্র্যাচুইটির জন্য কোম্পানির বিরুদ্ধে কেস করেছিলেন। কমিশন শ্রমিকদের পক্ষে রায় দেন— কোম্পানিকে নির্দেশ দেন শ্রমিকপিছু প্রায় দেড় লাখ টাকা করে যে টাকা কোম্পানি কম দিয়েছে, তা

অবিলম্বে মিটিয়ে দিতে এবং এতোদিন তা না দেওয়ার জন্য সে টাকার উপর সুদও শ্রমিকদের দিতে। তাও তো প্রায় চার বছর লেগে গেল এই রায় হতে। আজ কোম্পানির লোক নেই, তো কাল বিচারপতি নেই এভাবে হিয়ারিং পিছিয়ে পিছিয়ে ধৈর্যের সে এক অসীম পরীক্ষা! তারপরও, শ্রমিকদের পক্ষে রায় হলে কী হবে, কোম্পানি তা মানার কোনও লক্ষণই দেখায় না, শ্রমিকরা কোর্টের রায় নিয়ে টাকা দাবি করতে গেলে স্রেফ ভাগিয়ে দেয়। তারপর বরুণদা সেই তিন শ্রমিকদের নিয়ে গেলেন আলিপুরের ভবানী ভবনে সরকারের আদায়কারী দফতরে। মালিকের কাছ থেকে তাদের টাকা আদায় করে দেওয়ার কথা হলেও তারা তো নড়েচড়ে বসতেই অনন্তকাল কাটিয়ে দেয়— আট মাস তারা কিছু না করে কেসগুলোকে ফেলে রাখল। বোঝা গেল যে হাইকোর্টে কেস করে আদায়কারী দফতরের উপর হাইকোর্টের নির্দেশ বার করতে না পারলে আদায়কারী দফতর কিছুই করবে না। ফলে ধার করে হাইকোর্টে মামলা করার টাকা জোগাড় করে হাইকোর্টেই যেতে হল। হাইকোর্টের নির্দেশে নড়ে বসে আদায়কারী দফতর যখন টাকা আদায় করল— তখন প্রথম কেস করার থেকে ছয় বছর কেটে গেছে। তাও আদায়কারী দফতর পুরো টাকা আদায় করে দিল না, সুদের টাকা বাকিই পড়ে রইল— তার জন্য আবার হাইকোর্টে মামলা করতে হল। এবার কোম্পানিপক্ষ তাদের পক্ষে হাইকোর্টে দাঁড় করাল নামজাদা উকিল ও রাজনৈতিক নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে। ময়দানের বক্তৃতায় যে নেতা গলার শির ফুলিয়ে শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থে আপোসহীন লড়াই করার কথা বলে, সেই নেতাই কালো জোব্বা পড়ে শ্রমিকদের বঞ্চিত করার পক্ষে মালিক-ম্যানেজমেন্টের হয়ে সওয়াল করল। বহু টাকা ফি-এর নামী উকিলের কারসাজিতে সে কেস এখন 'রিভিউ' হওয়ার লাইনে চলে গেছে। কবে যে তার নিষ্পত্তি হবে কেউ জানে না!

****

শরীরটা খারাপ ছিল, তাই ক-দিন কাজে যান নি। একটু সুস্থ হতেই আজআবার যোগদান করতে এসেছেন। কিন্তু ডিপার্টে ঢোকার আগেই ওভারসিয়ার বললেন— আপনাকে আমি জয়েন করাতে পারব না, আপনি লেবার অফিস যান। বরুণ লেবার অফিস গেলেন। লেবার অফিসার বললেন— আমার কাছে

নয়, আপনি পারসোনালে যান। পারসোনালে ঢুকতেই ম্যানেজার চৌধুরী বললেন— আপনাকে আর দরকার নেই। বরুণদা আগেই আন্দাজ করেছিলেন, তাই নিঃশব্দে অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন। হাঁটতে হাঁটতে মিল গেটের বাইরে এসে দাঁড়াতেই, দুইজন ঘিরে ধরে বলল— বরুণ, আমার গ্র্যাচুইটি তো অর্ধেক মেরেই দিল। পাশ থেকে আর একটা কন্ঠস্বর— বরুণ, আমারও তাই। চারদিক থেকে আরও কন্ঠস্বর— বরুণ আমারও— আমারও— আমারও...। এই বিপন্ন কোরাসের মধ্যে ডুবে যেতে যেতে বরুণ পাগলের মতো চিৎকার করে ওঠে...
— এই–এই– কী হলো— পাশে শুয়ে থাকা স্ত্রী বরুণদাকে ডাকে, গায়ে হাত বুলিয়ে দেখে বরুণদার সমস্ত শরীরটা ঘামে ভিজে গেছে, থর থর করে কাঁপছে। পরম মমতায় বরুণদার আধোজাগা শরীরটাকে বুকের মধ্যে টেনে নেয় শ্যামলী, আঁচল দিয়ে পিঠের ঘাম মুছিয়ে দেয়, বলে— টেনশন নিয়ো না, আমি তো তোমার সাথে আছি, সংসার ঠিক চালিয়ে নেব।

–শ্রমিকদের হাতিয়ার, মার্চ ২০১৬

ফকির-কথা

দেশে এক ফকির ছিল। দীনাতিদীনের দেউলে তার সাধনা। আন্দাজি ধর্ম তার নয়। মানুষে ডুবে সে রতন খোঁজে। যে নদী জনপদের তৃষ্ণা মেটায়, তার ধারে বসে সে জলের কথা শোনে, বাতাসের কথা শোনে, দেহ-ব্রহ্মাণ্ডে তাদের রূপ খোঁজে।

একদিন সেই নদীর জলই ফকিরকে বলল, "এবার কোটালে নদীদেহে বিষ উঠবে, সে সময় নদীজল পান করলে মানুষ তার জ্ঞান হারাবে।"

ফকিরের স্থিরচিত্ত উতলা হয়ে উঠল, সে জনপদবাসীদের জনে জনে বলতে লাগল কোটালের আগেই খাওয়ার জল তুলে রাখতে, যাতে কোটালের জল খেতে না হয়, আর জ্ঞান রক্ষা করা যায়। সবাই-ই সে কথা শুনল, আর মনে না নিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দিল আজগুবি কথা বলে। ফকির ছাড়া কেউ-ই জল তুলে রাখল না।

কোটাল এল। নদীদেহে বিষ উঠল। ফকির ছাড়া আর সবাই নদীজল খেয়ে জ্ঞান খুইয়ে বসল, যার ফলে সমস্ত অস্বাভাবিক ব্যাপারকেই তারা স্বাভাবিক বলে ধরতে শুরু করল। নদীকে টুকরো টুকরো করে তারা নীলামে তুলল। সে নীলাম ঘিরে ঘুষ, ফেরেববাজি, লোক-ঠকানো, খুন-জখম, ধর্ষণ— এ সব অস্বাভাবিক কাজই মানুষের কাছে অতি স্বাভাবিক বলে মনে হতে লাগল।

একা ফকির কেবল চীৎকার করে ফেরে যে মানুষ তার জ্ঞান খুইয়ে অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। ঘুষ-ফেরেববাজির কারবার করা খুন-জখম-ধর্ষণের পান্ডারা যখন সমাজের মাথায় বসে একা ফকির কেবল তাদের মানে না। অজ্ঞানী অস্বাভাবিক মানুষসবের চোখে ফকির হয়ে উঠল বোধ-বুদ্ধি-হারানো পাগল, তারা ফকিরের সিধাকথা আর সইতেও পারল না। সবাই মিলে ফকিরকে সেই দেশ থেকেই তাড়িয়ে দিল।

– এখন শহরতলী, জুলাই-আগস্ট ২০১৪

রক্তের মধ্যে যে বোধ খেলা করে

কবিতার ইজেলে নিসর্গ
ধূ ধূ মাঠ অদৃশ্য ক্যানভাসে।

এই তো সেদিন
রঙ ছিল কত
হেমন্তের খবর ছিল রঙিন ভুবনে।

এখন পড়ন্ত বিকেল
তির্যক চেয়ে থাকে আগামী পৃথিবী
অদৃশ্য অবোধ্য কারাগারে
অপরাধ-না-জানা বন্দির মতো
যত ছটফট করি
হাতে পায়ে বাঁধন তত চেপে বসে।

বুকের ভিতর নৈঃশব্দ্যে
আগুনরেখা পোড়াতে পোড়াতে এগোয়
দগ্ধ কালো প্রান্তরে
সোনালি ছাই ফুটে ওঠে
যেন বা কবিতার লক্ষ তারা।

--২০১৮-র জুলাইয়ে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ
‘সোনালি তারার ছাই’ থেকে

কবিতার আলাপ-সালাপ

এখন শহরতলী পত্রিকার সম্পাদকীয় হিসাবে লেখা কিছু কথা

১

অন্ধকার সময়ের কবিতা কেমন হবে ?

সে কবিতা হবে অন্ধকারের মতো।

কবিতা তো কেবল সুসময় উদযাপনের রঙ-শিকলি নয়, সুসময় বয়ে আনা মসীহা-বাণীও নয়। আমাদের মতো ভাঙাচোরা মানুষজনের অন্ধকারে মুখ গোঁজা প্রাত্যহিক যাপনের থেকে উঠে আসা ক্রন্দন বা ক্রোধের চিৎকারও তো কবিতা। যে প্যালেস্তাইনে ক্ষমতাধর ইজরায়েলী রাষ্ট্রের পশুশক্তির আক্রমণ একটা গোটা জনগোষ্ঠীকে চারদিক ঘিরে বন্দী করে রাখে, যখন তখন সঁজোয়া গাড়ি বা বোমারু বিমান পাঠিয়ে শয়ে শয়ে জীবনকে মৃতদেহে পরিণত করে, দীর্ঘদিন ধরে করে আসছে, সেই প্যালেস্তাইন যখন কবিতার ভাষায় আমাদের সঙ্গে কথা বলে ওঠে, তখন মনে হয় আমাদের নিজস্ব বেঁচে-থাকা–গুলোও কবিতায় রূপান্তরিত হলে কার তাতে কী? বিদগ্ধ সমালোচকদের রসনিরূপনের আলোচনার জন্য এ সমস্ত কবিতা নয়, এ সমস্ত কবিতা কেবলই বাঁচার সংগ্রাম চালাতে চালাতে হঠাৎ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে তির্যক চোখে নিজেদের অর্জনকে দেখে নিয়ে মুচকি হেসে আবার চলতে শুরু করার জন্য।

– এখন শহরতলী, জুলাই-আগস্ট ২০১৪

২

আমরা আবার এখন শহরতলী পত্রিকা নিয়ে পাঠকের দরবারে হাজির হলাম। যদিও পত্রিকা প্রকাশে যথেষ্ট বিলম্ব হয়েছে, তবু সুধী পাঠক নিশ্চয়ই জানেন যে ইচ্ছা থাকলেও উপায় বার করতেই অনেকসময় কালঘাম ছুটে যায়।

এখন যেভাবে বাঁচতে হচ্ছে তা বেশ দুর্যোগপূর্ণ। বাজার-সর্বস্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষ কোণঠাসা হতে হতে হারিয়ে যাচ্ছে। আর অমানুষরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, তোলাবাজি, খুন, ধর্ষণ করে নাগরিক জীবনকে বিষিয়ে তুলছে।

এতোসবের ভিতরেও কি কবিতা হবে? নিশ্চয়ই হবে। অত্যাচারিত মানুষের, মানুষদের, ঘুরে দাঁড়ানোর ভিটে হয়ে উঠুক কবিতা। ক্রমশঃ ক্ষয়ে যাওয়া মানুষের, মানুষদের, পূর্ণতার সন্ধানে যাত্রা হোক কবিতা। অত্যাচারী, স্বৈরাচারী, বাজারি-রা বুঝে নিক যে কবিতা শুধু অবসরযাপনের নয়, কবিতা একটা দুরন্ত হাতিয়ারও বটে।

বিগত ২৭শে জানুয়ারি ২০১৫-তে কবি হাসেম সাবানি-কে চোরের মত রাতের অন্ধকারে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিল ইরানের স্বৈরাচারী শাসক। কেন? কারণ সাবানির কবিতা অত্যাচারী স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধে শানিত তরবারির মত ঝলসে উঠেছিল।

কবিতার ইতিহাসে এ অবশ্য নতুন নয়। বেঞ্জামিন মোলায়েজকে একই কারণে ফাঁসিতে ঝুলতে হয়েছিল।

সাবানি বা মোলায়েজরা মরণকে বরণ করে আমাদের প্রত্যেকের ঘাড়েই দায় চাপিয়ে যায় সাবানি বা মোলায়েজ হয়ে ওঠার। তাই আসুন, কবিতাকে হাতিয়ার বানাই— অনুপ্রাস, অব্যয়-এর শানিত কোপে ছিন্নভিন্ন করি অন্ধকারকে।

– এখন শহরতলী, এপ্রিল-মে, ২০১৫

৩

এবারের এখন শহরতলী নিয়ে যখন আমরা হাজির হলাম, বেশ কিছু দিন পরে আবার সাক্ষাতে সুধী পাঠককে যদি জিগ্যেস্ করি, 'কেমন আছেন?',

তাহলে ভালো থাকার সংবাদ হয়ত খুব কমই পাওয়া যাবে। আমরা সবাই মিলে ভালো থাকার যোগ্যতা কি হারিয়ে ফেলছি? গরুর মাংস রান্না করার অভিযোগে উত্তরপ্রদেশে ঘাতকবাহিনীর হাতে প্রাণ হারাতে হয় মুসলমান ভাইকে, হিন্দুত্ববাদীদের মেপে দেওয়া কথা আউড়ে না যাওয়ার জন্য কর্ণাটকে খুনীদের হাতে প্রাণ দিতে হয় ইতিহাসবিদকে— এমন ঘটনা ঘটে চলে একদিকে, আর অন্যদিকে বাংলাদেশে ইসলামের নাম করে নাগরিকদের খুন করা হয়, মধ্যপ্রাচ্যে মানবজীবন ও মানবইতিহাসের উপর চলে কালাপাহাড়ি আক্রমণ। দেশে-বিদেশে ক্ষমতার অলিন্দে রাজকেদারায় বসে থাকা ক্ষমতালিপ্সুরা ধর্মীয় মোড়ক পরিয়ে এইসব খুনেবাহিনীদের প্রয়োজনমতো লালনপালন করছে। আর ক্ষমতার পায়ে পিষ্ট হয়ে আমাদের যাদের দিন কাটছে, তারা কখনও ঘাতকবাহিনীর শিকার হচ্ছি, আবার কখনও বা প্রতিশোধে শিকারী হওয়ার জন্য কোনও এক ঘাতকবাহিনীতে নাম লিখিয়ে বসছি। ফলে আমাদের নিজেদের মধ্যে সন্দেহ-অবিশ্বাসের দেওয়াল যাচ্ছে উঠে, একে অপরের দিকে আড়চোখে চাইছি, একে অপরের মধ্যে বিপদের গন্ধ শুঁকছি। এভাবে বেঁচে মরে থাকাতেই কি আমরা আত্মসমর্পণ করব, নাকি প্রকৃত জ্ঞানচক্ষু মেলে বলতে পারব যে জগতজুড়ে ধর্ম একটাই-মানবধর্ম, আর বিভেদ ধর্মে নেই, বিভেদ আছে ক্ষমতাবান আর ক্ষমতাহীনে, সর্বভোগী আর সর্বত্যাগীতে। যদি আমরা পারি, তাহলে আবার আমরা আমজনতা মিলেমিশে নিজেদের মতো বাঁচার পরিসর গড়ে তুলতে পারব।

– এখন শহরতলী, জানুয়ারি, ২০১৬

ছায়ামানুষ

কেন না প্রতিদ্বন্দ্বী ছাড়া
আঁধারের বুক চিরে আলো ফুটত না,
গোধূলির ধূসর ছায়াপথে
অতৃপ্ত আত্মারা এখনও কিন্তু
ড্রাগন হয়ে ওঠে নি,
তাই হাঁটতে হাঁটতে দেওয়ালের মুখোমুখি হলেও
অপ্রতিহত সময়
ওস্তাদ কারিগরের মতো কাপড় ছেঁটে ছেঁটে
এক স্বপ্নের পৃথিবী নির্মাণ করে চলেছে—
অতীতে এই চিত্রকল্পেই তো
গোলাপ ফুটেছিল।

– এখন শহরতলী, জানুয়ারি ২০১৬

প্রিয় সৌমেন সমীপেষু

জানো সৌমেন,
সত্যিই আর কবিতা আসছে না,
কোথায় যে হারিয়ে গেল দিগন্তজোড়া বুনো হাঁসেদের দল,
কোথায় হারিয়ে গেল
সেই অপুদুর্গাদের জলা-জঙ্গল, ঘেঁটুবন,
ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে ভবঘুরে অপু,
অঘোরে ঘুমিয়ে আছে রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে,
দুঃখিনী দুর্গা আমার হারিয়ে গ্যাছে,
কামদুনী, বারাসাত…অনামিকা শহরের কোন কানাগলিতে।
নাঃ, আর কবিতা হচ্ছে না,
যত্তসব কুম্ভীলকী চাটুকার মকরধ্বজ,
বিব্রত অনুপানে ভীষণ তালকাটা
শুধুই আকাশ-ফাটানো চিৎকার
চৌরাস্তার মোড়ে বাজারি শব্দের ফুলঝুরি,
জীবনযাপন শালা সকালের স্বৈরিণীর মতো
ডাঁই ডাঁই আবর্জনার পাহাড়ে নদীনালার মতো
কেঁদে চলেছে যেন রাজা অয়দিপাউস।
সত্যি, ভাই সৌমেন, কবিতা আর হচ্ছে না।
কিছু দুর্বোধ্য ছোঁয়াচে শব্দকে ঘিরে
আমরা ক্রমশঃ আবর্তিত হচ্ছি,
কিন্তু কবিতা হচ্ছে না।

– এখন শহরতলী, এপ্রিল-মে ২০১৫

আগামীকাল

ভাবনার টুকরো টুকরো মেঘ
জমাট বাঁধে না এখন।
খরার মাঠে
অন্নগর্ভা পৃথিবী হেঁটে ফেরে
স্বপ্নময় অতীতে।

সুখউড়ানির চরে নিঃসঙ্গ শালিখ
ঠোঁটে ঠোঁট রেখে স্বপ্ন চালান করে
আপন আত্মজে।

এই অন্ধকারে যারা জেগেছিল
দলছুট বলাকার মতো
তারা জানত
রাত্রির শরীরে আছে
আগামীকালের বীজ।

-২০১৮-র জুলাইয়ে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ
'সোনালি তারার ছাই' থেকে

প্রতারক তরবারি

অথচ লালদরওয়াজার ফুটপাথও জানে
ক্ষুধার দুনিয়ায়
অশোক মোচী আর কুতুবুদ্দিন আনসারীর
যুদ্ধটা কোথায়!
ওরা কি জানত না
বেপরোয়া যৌবন পাগলের মতো প্রতিশ্রুতি দিলেও
বেইমানের জাত-ধর্ম হয় না,
কিংবা, প্রতারক তরবারি হাজার কুরুক্ষেত্র দেখলেও
এখন যুদ্ধের মাঠে কিছুই কাটতে পারে না!
আসলে রামধেনু দেখে দেখে
প্রাকমৃত্যু দুজনেই মরে গ্যাছে,
কেন না ব্রুটাসও জানত
এই দুষ্ট ক্ষমতাচক্র তাকে হাতিয়ার করছে।

(২০০২ সালের গুজরাট গণহত্যার সময় রাজপথে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে আস্ফালনরত যে যুবকের ছবি বহুল-পরিচিত হয়েছিল, সেই যুবকের নাম অশোক মোচী। আর যে যুবকের দুই হাত জড়ো করে হত্যাকারীদের কাছে প্রাণভিক্ষা চাওয়া, আতঙ্ক ও চোখের জলে মুখ ছেয়ে যাওয়ার ছবিও একইসঙ্গে বহুল প্রচারিত হয়েছিল, তার নাম কুতুবুদ্দিন আনসারী। কবিতাটি লিখতে গিয়ে একটি আরবি কবিতার ছায়া তাতে পড়েছে।)

-২০১৮-র জুলাইয়ে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ
'সোনালি তারার ছাই' থেকে

মুখ ও মুখোশ

এভাবে কাউকে থামানো যায় না
কেন না ক্রান্তিবলয়ে যারা জেগে আছে
গণপতির উপাসককে তারা আগেই চিহ্নিত করেছে।
লবঙ্গবনে ঝড় উঠলেও
শাখামৃগের লম্বা চোয়ালে যে প্রেত ভর করেছিল
আসলে সে আফিঙ-এর ঘোরে ছিল
যেন বেহেস্তের দরজা খোলা
প্রবেশ অবাধ।
এক একটি সোপান
একটি করে বোকা কবুতর
হাততালি দিলেই মহাশূণ্যে পরমানন্দে পাল্‌টি খায়।
মুখ আর মুখোশের ছৌনাচে যবনিকা পড়লে
সুখের বিছানায় দুঃস্বপ্নের স্মৃতি তাড়া করে।
জানো অবিনাশ,
কাউকে থামাতে গেলে
আগে নিজের দাঁড়ি-কমা-গুলো দেখে নিতে হয়,
নইলে বারো ফুট রাস্তাও বড় সংকীর্ণ মনে হয়।

-২০১৮-র জুলাইয়ে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ
'সোনালি তারার ছাই' থেকে

খুঁজে ফেরা

কথা হল ঢের, স্বপ্ন অধরাই।
কোরান পড়া হল, বেদ পড়া হল,
নিজামুদ্দিন ডাকাত আজও ডাকাতি ছাড়ল কই।

সাজানো বাগান,
মুখে দারুচিনি,
ভেতরে অন্ধকার জমাট।
বেরোনোর পথ কই ?

কবিকে কি পথ খুঁজেছে ?
না কবিই খুঁজছে পথ,
কবিই খুঁজছে স্বপ্নময় পৃথিবী ?

-২০১৮-র জুলাইয়ে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ
'সোনালি তারার ছাই' থেকে

এই পথে

হাঁটতে হাঁটতে সেই তেমাথার মোড়ে
থমকে দাঁড়ালাম।
সামনে পিছনে দেখি কেউ নেই
কেবল ধূ ধূ মাঠ।
পড়ন্তবেলায় ধূসর আকাশে বালি হাঁসের দল
উড়ে চলেছে অজানায়
ছায়া গোধূলিতে।
মোয়াজ্জেনের উদাত্ত আহ্বান
আল্লা হু আকবর
ম্যারাথনে ক্লান্ত পায়ে
যন্ত্র-ছুট স্বপ্নের পিছনে।
বৃষ্টি হয়ে ঝরে যেতে চাই
মেঘদূতের পঙক্তি জুড়ে।
কতজন হেঁটে গেছে
আরো কত হেঁটে যাবে
এই পথে।

-২০১৮-র জুলাইয়ে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ
'সোনালি তারার ছাই' থেকে

নীরবতা

সব নীরবতা অম্বরের মতো নয়।
যুগ-যুগান্তরে যতই কুরবানী দাও
সে তো উদ্বর্তনেরই পরিশীলিত রূপ।
অথচ রূপকথার মতো বিকেল গড়ায়,
বৈতরণী পারের গল্প শোনায়।
এই সব ছবি,
এই সব নীরবতা
কবরের মতো নয়।
ধরণীর ক্ষুদ্র পরিসরে
দানব বা মানব– সবই সমান–
সুযোগ পেলেই আদমখোর হয়ে ওঠে।

-২০১৮-র জুলাইয়ে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ
'সোনালি তারার ছাই' থেকে

জীবন যেমন

প্রবাহিত জীবন রোদ বৃষ্টি উষ্ণতায়
ধ্বনিমুখর
হারা জেতা উচ্ছ্বাসে শোকে
চাপাপড়া আর্তনাদে
সব অভিব্যক্তির প্রসারিত সময়
স্থির বিষন্নতায় জাগরণ
দিবারাত্রি পুড়তে থাকে বুকের ভেতর

অনন্ত পথ
মোড়ে মোড়ে মেশায়ার মতো দাঁড়িয়ে
নিয়ন্ত্রণে নাগরিক জীবন সব মাতব্বর
অথচ জানালা খুললেই
দামাল সূর্য আলো করে ঘর

-২০১৮-র জুলাইয়ে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ
'সোনালি তারার ছাই' থেকে

শেষ ইচ্ছা

যবনিকা পতনের আগে
আর একবার তার মুখোমুখি হতে চাই

এত দলিল দস্তাবেজ
তবু বিবর্তনে মানুষ
আজও পাষাণের বুকে মাথা ঠোকে

প্রবেশ অবাধ
তবু স্বপ্নের সন্নিবর্তী হলেই ছন্দপতন ঘটে

সবই ছিল খোদার রাজ্যে
সবার সমান হক
তবু চোখ খুললেই বেদখল আকাশ
মাঠ সাগর নদী

চোখ খুললেই
ধূ ধূ সমুদ্রতটে নিথর আয়লান কুর্দি
ওমর তাসখিনরা গোটা উপত্যকায়
দুয়ো দুয়ো করতে থাকে

এ পড়ন্ত বিকেলে
ধূসর চোখ
থম্ মারা পা
স্মৃতিবিব্রত অন্ধকারে
কে ডাকে
কার আর্তচিৎকার
রাতভোর জাপটে থাকে

-২০১৮-র জুলাইয়ে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ
'সোনালি তারার ছাই' থেকে

রোজা

সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত নির্জলা উপবাস
ইসলামের তৃতীয় ভিত্তি রমজান মাস
বেহেস্তের দরজা খোলা
গুরুজনমতে নিয়ম মতো চললেই স্বপ্নপূরণ
অস্তাচলের মায়াপথে সোনার রথে
উঠে পড়
অনন্ত সময় হবে জান্নাতবাস
বঞ্চনার এ জীবন জুড়ে চলছে রমজান
রোজাতেই চলে গেল আল্লাহর দেওয়া প্রাণ

-২০১৮-র জুলাইয়ে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ
'সোনালি তারার ছাই' থেকে